একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশের সংকলন

একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ॥ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

একুশে ফেব্রুয়ারী ॥ একুশের সংকলন ১৯৭৭ ॥ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে মতিউর রহমান কর্তৃক ১৫ লারমিনি স্ট্রিট,
ওয়ারী, ঢাকা–৩ থেকে প্রকাশিত ॥ মুদ্রণেঃ এ্যাবকো প্রেস, ৬–৭ আওলাদ
হোসেন লেন, ঢাকা–১ ॥ মূল্য ঃ এক টাকা

সাঁতাত্তুরের একুশের শপথ

একুশে ফেব্রুয়ারী। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঐতিহাসিক দিন। একুশের অমর শহীদানের পবিত্র স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের সাথে সাথে এই দিনে আমাদের জনগণ গ্রহণ করেন নতুন শপথ।

মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবন দিয়ে যাঁরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লড়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, যে লাখো শহীদ আত্মাহুতি দিয়েছেন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে, তাঁদের সকলকে আজ আমরা স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়।

পঁচিশ বছর আগে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের জনগণের স্বাধীন জাতীয় বিকাশের যে চেতনা স্ফুরিত হয়েছিল, তারই ক্রম-উত্তরণের ধারায় অসংখ্য লড়াইয়ে অগণিত শহীদের আত্মদানের পরিণতিতে এক গৌরবময় সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। এ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সকল অশুভ চক্রান্ত প্রতিহত করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সংহত করা, স্বাধীনতার সুফল রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ কার্যকর অংশগ্রহণ-ভিত্তিক প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জন; শহীদের স্বপ্ন—শোষণমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে, জনগণের সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি ও সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ নিরলস কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার পথে দেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে ব্রতী হওয়াই সাতাত্তুরের একুশের শপথ।

মোহাম্মদ ফরহাদ	১	আমরা আমাদের উৎসর্গ করে রেখেছি
বজলুর রহমান	৬	স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে
অজয় রায়	১৯	সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য চাই
মতিউর রহমান	৩৫	অপুঁজিবাদী পথ ও সমাজতন্ত্র
আবদুল হালিম	৫১	বাংলাদেশ ও নতুন ইতিহাস বিচার
মফিদুল হক	৬৪	মুনাফা, রক্ত ও বন্দী তৃতীয় বিশ্ব

আমরা আমাদের উৎসর্গ করে রেখেছি

মোহাম্মদ ফরহাদ

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ আমাদের সমগ্র দেশবাসীর জাতীয় চেতনার উন্মেষের দিন। যদিও ’৪৭-এর আগস্টে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমাদের পার্টির তীব্র রাজনৈতিক লড়াই চলছিল, আমাদের কমরেডরা অনেক ক্ষেত্রে সরকারী বুলেটে শাহাদৎ বরণ করছিলেন—কিন্তু তবু বলব—এদেশে প্রকৃত অর্থে গণ-সংগ্রাম আর গণমানুষের নব চেতনার সূচনা ‘অমর একুশ’ থেকেই। ভাষার দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ’৪৮ সালের মার্চ মাস হতে। কিন্তু ’৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী—শহীদের রক্তরাঙা ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’—প্রগতিশীল জাতীয় চেতনার প্রকৃত উন্মেষের দিন, জাতীয় সংগ্রামের প্রকৃত সূচনার দিন।

‘অমর একুশের’ সংগ্রামের এবার পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। এক শতাব্দীর সিকি ভাগ। অনেক ঘটনাই ঘটেছে। আগা গোড়াই চলেছে সংগ্রাম। এসব সংগ্রামে জনগণ অর্জন করেছেন অনেক বড় বড়

বিজয়। আবার পরাজয় নেই—তা নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হবে আমাদের দেশবাসী মূলতঃ নূতন নূতন বিজয়ের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছেন, যদিও সে পথ মোটেই মসৃণ নয়, যদিও সে পথের ধূলি সিক্ত রয়েছে অনেক শহীদের রক্তে। কিন্তু আমাদের দেশবাসীর সংগ্রাম আর শহীদের রক্তদান বৃথা যায়নি। জনগণের সংগ্রাম আর শহীদানের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। '৫২-র ভাষা সংগ্রামেরই চূড়ান্ত পরিণতি হল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষাভাষী জনগণের জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

'৫২-র অমর একুশেতে সূচিত গণ সংগ্রামের গতি আজও অব্যাহত আছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের দেশবাসীর খুবই সামান্য অংশ বাদ দিয়ে সকলেই গরীব। শতকরা ৯৫ জনই মেহনতী মানুষ। আর দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে আমরা শতাব্দী শতাব্দীব্যাপী শোষিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত। ভাষার দাবীতে আমরা সংগ্রাম করেছি বটে, এবং সে সংগ্রাম ছিল মহান গৌরবের সংগ্রাম নিঃসন্দেহে, কিন্তু আজও জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর। আমাদের জনসংখ্যার বিপুলতম অংশ আজও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য। কাজেই, বলার অপেক্ষা রাখে না যে অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা কাটাতে না পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যায়। '৫২-র একুশের চেতনা কেবল জাতীয়তাবাদী চেতনারই উন্মেষ ঘটায়নি—'৫২-র একুশের সংগ্রাম আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে উঠার, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক প্রগতিশীল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিও সৃষ্টি করে গিয়েছিল। তাই '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে এদেশে কেবল নিছক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই গড়ে উঠে নি, সে সঙ্গে মেহনতী মানুষের প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সংগঠন-আন্দোলনকেও কিছুটা নূতনভাবে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির প্রভাব ও অন্যান্য আরও নানা কারণে এদেশে বামপন্থী প্রগতিশীল আন্দোলন যে বিচ্ছিন্নতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে পড়েছিল, ’৫২-র ভাষা আন্দোলন সে বিচ্ছিন্নতা ও সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে তুলতে প্রভূতভাবে সাহায্য করে। কিন্তু সাধারণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আন্দোলন-সংগঠনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অথবা সাধারণ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে মূলগতভাবে প্রভাবিত করে প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলন-সংগঠন-নেতৃত্ব নানা ঐতিহাসিক কারণেই রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে নি, যদিও বহুভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিল। এটা ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য। প্রগতিশীল বামপন্থীদের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল কিনা, কোন ব্যর্থতা ছিল কিনা—সে সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে একথাই আজ বলতে চাই যে ‘একুশের’ সংগ্রামের পথ এবং ধারা ধরেই ’৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়। আর ইতোমধ্যে দুনিয়ার অবস্থাও গিয়েছে অনেক বদলে। ’৫২ সাল আর ’৭১ সাল—এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দুনিয়াতে সমাজতন্ত্রের শক্তি আরও বিকশিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আর তার প্রভাব আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামেও এসে পড়েছে। জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল জনগণের সমর্থনপুষ্ট মধ্যবর্গের সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের হাতে। এগুলি হল ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তব ঘটনা। আর তার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমরা লাভ করেছি অনেক নূতন নূতন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষ করেছি অনেক অদ্ভুত পরস্পর বিরোধী ঘটনা। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ঘোষিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু সমাজজীবনে বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্নীতি। মেহনতী জনগণকে সচেতন, সমবেত ও সংগঠিত করে সমাজবিরোধী মুনাফাখোর-মজুতদারদের মোকাবেলা করা তখন সম্ভব হয়নি। তেমনি বড় বড় কলকারখানায় ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে সব পরিচালনার দায়িত্ব নিরঙ্কুশভাবে রয়ে গিয়েছিল হয় প্রাক্তন মালিক অথবা বৃটিশ-

পাকিস্তান কর্তৃক প্রশিক্ষিত আমলাদের হাতে। ফলাফল সকলেরই জানা আছে।

তাই এক কথায় বলা যায় যে 'একুশের' পথ ধরে যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, রাজনৈতিকভাবে তা ছিল শক্তি ও দুর্বলতা মিশ্রিত। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা উত্তরকালে নীতি এবং কর্মসূচী হিসাবে দেশবাসী পেয়েছেন অনেক প্রগতিশীল ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি, পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় চার নীতি। দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল মাত্রই এগুলোর মূল্য দেবেন এবং দিয়েছেন। কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিত্র ছিল ভিন্নতর। সেটাই হল সংকট। এই সংকট হল আসলে আমাদের দেশের গণসংগ্রামেরই দুর্বলতার ফল।

গণচেতনা ও গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে দুর্বলতাকে কাটাতে না পারলে অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতাকে কাটিয়ে তোলা তো পরের কথা—রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সংহত করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতা-উত্তরকালের কতক ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে আজ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এরা সুযোগ পেলেই জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সংগীত বদলের আবদার তোলার সাহস দেখাতে পারছে। এরা স্বাধীনতার সুফলগুলোকে নস্যাৎ করে দেশকে পিছিয়ে দিতে চায়, অস্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চায়। এদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা ও পরাভূত করতেই হবে। সেজন্য প্রয়োজন ব্যাপক দেশপ্রেমিক ঐক্য। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তর্কের উর্ধ্বে—বাংলাদেশের জন্য লড়েছেন এবং স্বাধীনতা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ—এমন সকল শক্তি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির ঐক্য।

এ রকম ঐক্য অতি প্রয়োজন এবং দেশের অগ্রগতির প্রথম শর্ত। কিন্তু একই সঙ্গে দ্বিতীয় শর্ত হল আত্মনির্ভরশীলতার পথে অর্থনীতিকে অগ্রসর করে নেওয়া, দেশ গড়ে তোলা। বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবিষয়ে সচেতন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অতীতের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে দেশগড়ার কাজটায় ফাঁক পড়ে গেলে—স্বাধীনতা-বিরোধী

গোষ্ঠীগুলিই সে সুযোগটা নিয়ে নেয়। কাজেই দেশপ্রেমিক মাত্রেরই অতি অবশ্য কর্তব্য দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া। একাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রতি অতি অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, গণজীবনের আশু সমস্যাগুলির সম্ভবমত দ্রুত ন্যায্য সমাধান। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন।

আমরা, কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সংহত করার জন্য, জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এবং বন্ধুদেশসমূহের নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীলতার পথে দেশ গড়ে তোলার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে বাস্তব কাজে লেগে থাকার নীতিতে অবিচল আছি এবং থাকব। আজকের এই পবিত্র দিনে 'একুশের' অমর শহীদ ভাইদের নামে আমরা শপথ নেব যে জনগণের জন্য শোষণহীন সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে চলবে আমাদের সংগ্রাম, আত্মনির্ভরশীল দেশগড়ার পথে। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেশবাসীরই যুগ যুগের স্বপ্ন। বরকত, রফিক, জব্বার, সালাম—'একুশে'র শহীদ ভাইরা......আরও আরও শহীদ ভাইরা—সকলেই সে স্বপ্ন দেখেছেন। সে স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে আমরা আমাদের উৎসর্গ করেছি।

স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে

বজলুর রহমান

দু’শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে বাংলাদেশ ছিল পরপদানত। প্রথমে বৃটিশ ও পরে পাকিস্তানী শাসকদের নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। পাঁচ বছর আগে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করলো ততদিনে আমাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত।

যুগযুগান্তের শোষণ ও বঞ্চণার ফলে সব দিক থেকে চরম অনগ্রসর এক অর্থনীতির উত্তরাধিকার নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। কৃষিব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের,শিল্পবিকাশ বলতে গেলে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। অন্যদিকে রয়েছে বিপুল বিশাল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। শ্রমের উৎপাদনশীলতা খুবই কম। তার উপর আবার কর্মক্ষম জনশক্তির এক তৃতীয়াংশই বেকার বা আধা বেকার। শতকরা পঞ্চাশ জন মানুষের অবস্থান দারিদ্র্যরেখার নীচে—যারা দু’বেলা খেতে পায় না, মাথা গোজার ঠাঁই, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে।

জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। জনসংখ্যার ঘনত্ব বিচারে তার স্থান তালিকার শীর্ষে। ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার মধ্যে বাস করে ৭·৯ কোটি মানুষ। তন্মধ্যে ৭·২ কোটির বাস গ্রামে, ৫·৮ কোটি কৃষির উপর সরাসরি ও সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ফলে স্বভাবতঃই ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী। গ্রামীন জনসাধারণের মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ০·৩ একর। তদুপরি ভূমি বন্টনে বৈষম্যের দরুণ কৃষক পরিবারগুলোর এক বিরাট অংশ ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন।

জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষিকার্যে নিয়োজিত থাকলেও সাবেকী পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা খুবই কম। কৃষির এই পশ্চাৎপদতার ছাপ গোটা অর্থনীতিতে সুস্পষ্ট। কারণ কৃষিখাত থেকেই আসে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬০/৬৫ ভাগ।

শিল্প বিকাশের দিক থেকে বাংলাদেশ খুবই পিছিয়ে পড়া। জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান শতকরা ১০ ভাগ বা তারও কম। এর মধ্যে আধুনিক বা বড় শিল্পের অংশ শতকরা ৬ ভাগের বেশী নয়। শ্রমশক্তির শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে কৃষিকার্যে নিয়োজিত, সেক্ষেত্রে শিল্পে নিয়োজিতদের হার শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগেরও কম। বৃটিশ আমলে বাংলাদেশকে কলকাতার পশ্চাৎভূমি করে রাখা হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের প্রতি আদৌ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পাকিস্তানী আমলেও বাংলাদেশের পাট বেচা টাকায় করাচী লাহোরে কলকারখানা গড়ে উঠেছে কিন্তু বাংলাদেশ রয়ে গেছে যে তিমিরে সে তিমিরেই। পাট শিল্প ছাড়া উল্লেখ করার মত তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি।

এ অবস্থায় স্বাধীনতা এলো দেশকে পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধ ও অগ্রসর স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার তাগিদ নিয়ে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার পবিত্র কর্তব্য নিয়ে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে অতীতে যে সুযোগ কোন-

দিন ছিল না, মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে বাঙালী জাতি প্রথম নিজের হাতে নিজ ভাগ্য গড়ে তোলার অধিকার পেল।

॥ ২ ॥

কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির পথ কি?

কোন্ পথে বাংলাদেশ তার পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে গড়ে তুলতে পারবে অগ্রসর ও সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি?

কোন্ পথে সম্ভব হবে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ তথা শিল্প গঠন ও কৃষির আধুনিকীকরণ এবং জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ের সুষম বন্টন, সকলের জন্যে কাজ ও অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা?

যে সুখী, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন, অকাতরে আত্মদান করেছেন, তার সফল রূপায়নের পথটি কি?

প্রায় সিকি শতাব্দীর পাকিস্তানী শাসনে বাংলাদেশের মানুষ দেখেছেন উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত একটা পশ্চাৎপদ দেশ পুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করলে তার পরিণতি কী হয়। এক ধরনের শোষণের স্থান গ্রহণ করে আরেক ধরনের শোষণ। এতে কিছু কিছু শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠে, জাতীয় উৎপাদনও বাড়তে পারে, কিন্তু শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তি আসে না। ধনী আরও ধনী হয়, গরীব হয় আরও গরীব, আরও বেশী শোষিত। মুষ্টিমেয় মানুষ হয় যাকে বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য।

এই অভিজ্ঞতার দরুন জাতিগত অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে বাঙালী জনগণের মধ্যে গণমুখী শোষণহীন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের আকাঙ্খাও গড়ে উঠতে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে জন-

গণের এই আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। উনসত্তুরের গণআন্দোলন ও একাত্তুরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পরিণতিতে সমাজতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম মৌল রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে।

স্বাধীনতা-উত্তর বংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল। সামন্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অবস্থান দুর্বল। একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী অনুপস্থিত। এ অবস্থায় অ-পুঁজিবাদী পথ ধরে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উৎপাদিকা শক্তিগুলোর বিকাশের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্তগুলো সৃষ্টি করা সম্ভব ও বাঞ্ছিত। অ-পুঁজিবাদী বিকাশের অর্থ সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষগুলো নির্মূল করা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং অবাধ পুঁজিবাদের বিকাশকে খর্ব করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ও নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসেবে গড়ে তোলা। বর্তমান পশ্চাৎপদতা ও আধা-সামন্তবাদী আধা-ধনবাদী স্তর থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এটা একটা অপরিহার্য অন্তর্বর্তী পর্যায়। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বলা হয়, অ-পুঁজিবাদী বিকাশের কর্মসূচী সে স্তরেরই অর্থনৈতিক রূপরেখা।

স্বাধীনতা লাভের পর ব্যাংক-বীমা, পাট, সূতীবস্ত্র, চিনি প্রভৃতি শিল্প সমবায়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত গড়ে তোলা হয়। বড় শিল্পের শতকরা ৮৫ ভাগ অন্তর্ভুক্ত হয় রাষ্ট্রীয় খাতে। এই ভাবে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত গড়ে ওঠে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রেও ১০০ বিঘা জমির সিলিং ধার্য, ইজারাদারী প্রথা বাতিলের ন্যায় কতক পদক্ষেপ নেয়া হয়। সর্বস্তরের কৃষকদের সমবায়ে গ্রাম জীবনের ও কৃষি উন্নয়নের জন্য সর্বত্র সমবায় গঠনের লক্ষ্যও ঘোষিত হয়।

কিন্তু একদিকে জনস্বার্থে অর্থনীতি পরিচালনায় সক্ষম ক্যাডারের অভাব, অন্যদিকে মাথাভারী প্রশাসন, ব্যাপক দুর্নীতি, ত্রুটিপূর্ণ বন্টন নীতি প্রভৃতির ফলে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতির ধাক্কা কাটিয়ে শিল্পোৎপাদন ১৯৬৯ এর পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয় না। এই সময় বিশ্ব পুঁজিবাদী

বাজারের সংকট, আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বন্যা, খরা প্রভৃতির দরুণ উপর্যুপরি শস্যহানির ফলে খাদ্য সংকট বৃদ্ধি অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলিও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না। গ্রামীন অর্থনীতি যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই শুধু যে থেকে যায় তাই নয়, বরঞ্চ এ সময় সেখানে সংকট বৃদ্ধি পায়। এক কথায় স্বাধীনতাউত্তরকালে স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য যে নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

॥ ৩ ॥

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক জনগণের আকাঙ্খা এবং স্বাধীনতাউত্তরকালে সে লক্ষ্যে গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সমর্থন কোন সময়ই লাভ করেনি। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে অবাধ ধনবাদের সপক্ষে তারা গোড়া থেকেই আওয়াজ তুলে এসেছে। জাতীয়করণের বিরুদ্ধে এরা সব সময়েই ছিল উচ্চকণ্ঠ। এদের কথা হলো সমাজতন্ত্র দেশের উন্নতি বিধান করতে পারবেনা। পাকিস্তান আমলে যে ধারায় দেশ চলছিল স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই একই ধারা অব্যাহত থাকুক। এদের মতে প্রয়োজন কৃষি শিল্প সর্বত্র অবাধ ধনবাদের বিকাশ। অবাধ ধনবাদের বিকাশের ফলে মুষ্টিমেয়ের জীবনে প্রাচুর্য্য ও স্ফীতি দেখা দিলেও অধিকাংশের জীবনে যে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও বেকারী নিত্যসংগী হয়ে দাঁড়ায় সে কথাটা তাদের কাছে গৌণ। রাষ্ট্রীয় খাতকে দুর্নীতি ও সর্বপ্রকার অব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে জাতীয় স্বার্থেই দক্ষ ও সফল করে তোলা প্রয়োজন সে কথা না বলে তারা রাষ্ট্রীয় খাত বাতিলের আওয়াজ তোলে।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রতিক্রিয়াশীলরা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের প্রগতিশীল ধারাকে

সম্পূর্ণ পাল্টে দেবার জন্য আরও জোরে সোরে চেষ্টা চালাতে শুরু করে। অবাধ ধনবাদের প্রবক্তারা সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা ও অন্যান্য প্রগতিশীল নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালায়। 'যত দোষ নন্দ ঘোষের' মতো দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সকল সমস্যাকে তারা 'সমাজতন্ত্রের কুফল' বলে প্রচার চালাতে থাকে। যেন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বাতিল করে অবাধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হলেই দেশে দুধ ও মধুর নহর বইতে শুরু করবে!

স্বভাবতঃই সবচেয়ে বেশী আক্রমণ আসে জাতীয়করণ নীতি ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উপর। জাতীয়করণ বরবাদ করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কল-কারখানা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়ার দাবী খোলাখুলিভাবে জানানো হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক ছিলেন পুঁজিবাদী নীতির প্রকাশ্য প্রবক্তা। তিনি এ দাবী মেনে নিতে পারলে খুশীই হতেন। কিন্তু কলকারখানা কিনে নিতে পুঁজিপতিদের সামর্থ্য ও ক্ষেত্র বিশেষে আগ্রহের অভাবে জাতীয়করণ বরবাদ করার নীতি বেশীদূর এগোতে পারেনি। অন্যদিকে মোশতাক নিযুক্ত অর্থনৈতিক টাস্ক ফোর্স তাদের রিপোর্টে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বাতিলের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধানের উপরই জোর দেয়। জাতীয়করণ-বিরোধীদের বক্তব্য কার্যক্ষেত্রে অসার প্রতিপন্ন হয়। ভাগ্যের পরিহাস, সেই মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বর্তমানে নিজেই মারাত্মক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত।

বর্তমান সরকারের আমলে একটি নয়া পুঁজি বিনিয়োগ নীতি ঘোষিত হয়। এতে বেসরকারী খাতকে বহু সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলেও ব্যাঙ্ক, বীমা, পাট, কাপড়, ইস্পাৎ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়কে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

তবে বর্তমানে মূল ঝোকটা বেসরকারী খাতের দিকে। সরকার চাচ্ছেন বেসরকারী খাতে শিল্প সম্প্রসারণ যথাসম্ভব বিপুলভাবে ঘটুক। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বেসরকারী খাতে শিল্প প্রসারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু লক্ষ্য রাখা দরকার, বেসরকারী খাতের উপর অতিরিক্ত জোর

আমাদের দেশের জনগণের শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে যেন নস্যাৎ করতে উদ্যত না হয়। এ আকাঙ্খার কথা মনে রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ও নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসাবে গড়ে তোলা ও ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত করা এবং এই ভাবে অধনবাদী বিকাশের পন্থায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

॥ ৪ ॥

স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে অবাধ পুঁজিবাদী বিকাশের পথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে না। পশ্চাৎপদতা ঘুচিয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শ্রমিক কৃষকসহ সকল মেহনতী মানুষের মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো অভিন্ন হলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন ছক কাটা পথ নেই। প্রত্যেক দেশকে তার নিজ নিজ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজতন্ত্র কায়েমের পথ রচনা করতে হয়। বাংলাদেশের মত বহু সদ্যস্বাধীন উন্নয়নগামী দেশ আজ সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য অ-পুঁজিবাদী পন্থায় এগিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় এসব দেশ সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের মৌলিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠছে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী পথের অনুসারীরা ঘুরপাক খাচ্ছে সঙ্কটের আবর্তে। কাজেই বাংলাদেশকেও দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বাধীন ও স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান স্তরে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আগেই বলেছি আমরা মনে করি বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের একার পক্ষে দেশের শিল্পায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ

করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতবহির্ভূত পুঁজি ও সম্পদ, মেধা, উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা যাতে শিল্পায়নের কাজে লাগতে পারে সেজন্যে বেসরকারী খাতকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ দেয়া কর্তব্য। অন্তর্বর্তীকালীন 'মিশ্র' অর্থনীতির স্তরে সরকারীর সাথে বেসরকারী খাতের, পরিকল্পনার সাথে বাজারের সমন্বয় ঘটানো অপরিহার্য। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে বেসরকারী খাতকে জাতীয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনার আওতার মধ্যেই কাজ করতে হবে। বেসরকারী খাতকে উৎসাহ দানের নামে আমাদের সীমিত সম্পদের যাতে অপচয় না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বর্তমানে শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে জোর দেয়া হচ্ছে আমদানী বিকল্পন ও রপ্তানি বৃদ্ধির উপর। এই নীতি মোটামুটিভাবে ঠিকই আছে, তবে মূল ও ভারী শিল্পের দিকেও নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে বিরাট পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পগোষ্ঠী। পাট শিল্পেরও আরও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বর্তমান। আমাদের আছে বিরাট জনশক্তি তথা সস্তা শ্রম। বিদেশ থেকে কাঁচামাল এনে রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তুলে আমরা আমাদের শ্রম ও বিদ্যুৎ রপ্তানির ব্যবস্থা করতে পারি।

বাংলাদেশ জনশক্তির দিক থেকে সমৃদ্ধ ও পুঁজির দিক থেকে দরিদ্র। কাজেই এখানে অবলম্বন করতে হবে শ্রমঘন উৎপাদন কৌশল। বিদেশ থেকে 'টেকনোলজি' বা কৃৎকৌশল আমদানীর সময় এদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

কৃষি আমাদের প্রধান শিল্প। আগেই বলা হয়েছে কৃষিতে নিযুক্ত আমাদের শ্রম-শক্তির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ এবং জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ আসে কৃষি থেকে। অন্যদিকে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও খুবই নীচু মানের। কাজেই কৃষি ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কার ও কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মারফত কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে না পারলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না।

কিন্তু আবার প্রশ্ন উঠে, কৃষির আধুনিকীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায় কি?

পাকিস্তানী আমলেও কৃষি উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন প্রভৃতি অনেক কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালে কৃষি উন্নয়নের জন্যে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তার মূলে ছিল তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী তথা পুঁজিবাদী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী। ভূস্বামীদের সাথে কতকগুলো আপোষ করে পুঁজিবাদী পন্থায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাই ছিল সে সময়কার 'কৃষি উন্নয়ন' পরিকল্পনার সার কথা। তারা ভূমি সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয় নি, বরং গ্রামের শোষক ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতে সস্তাদরে সার, সেচের পাম্প, উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রভৃতি উৎপাদন উপকরণ তুলে দিয়ে ধনীকে আরও ধনী ও গরীবকে আরও গরীব বানানোর ব্যবস্থা করেছে। ফলে কৃষিতে ধনবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মেহনতী কৃষকদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে, গ্রামে শ্রেণী বৈষম্য বেড়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের নামে এই অবস্থা চলতে দেয়া নিশ্চয় কাম্য হতে পারে না। কৃষি উন্নয়নের জন্যে আমাদের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীন জীবনের শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস পায় এবং মেহনতী কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে থাকে।

গ্রামীন সমাজচিত্রের দিকে একনজর তাকালে বিষয়টার গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে উঠেবে।

১৯৬৭ সালের মাস্টার সার্ভের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমাদের দেশে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা ২৫ লাখ। গরীব চাষী, যাদের জোতের পরিমাণ গড়ে ১·৮০ একর, পরিবার পরিজনসহ তাদের সংখ্যা ২ কোটি ৭৫ লাখ। মাঝারি চাষী যাদের প্রত্যেকের হাতে গড়ে জমি আছে ৬·৪০ একর, পরিবার পরিজনসহ তাদের সংখ্যা ২ কোটির কাছাকাছি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গত দশ বছরে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের সংখ্যা আরও বেড়েছে। অন্যদিকে শতকরা

৮ ভাগ জোতের মালিকদের হাতে রয়েছে মোট জমির শতকরা ৬০ ভাগ। বাংলাদেশে ৩০ হাজার পরিবার আছে যাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ২৫ একরের বেশী।

উপরের তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে, ভূমি বন্টনে বৈষম্য বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া কোন পরিকল্পনাতেই গ্রামীন সমাজের যারা শতকরা ৯৩ জন সেই মেহনতী কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভূমি সংস্কারের অভাবে কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের বেশ কিছুটা সূচনা হয়েছে এবং গ্রামীন সমাজে শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ স্বাধীনতার পর প্রথম তিন বছর খাদ্যশস্যসহ কৃষি পণ্যের অস্বাভাবিক চড়া দরের ফলে কৃষির লাভজনকতা এবং কৃষিতে পুঁজিবিনিয়োগের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিবিদদের মতে ওই সময়ের দুর্মূল্যের ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা না থাকলেও ধনী কৃষক ও জোতদাররা লাভবানই হয়েছিল।

কৃষি উন্নয়নের যে কোন প্রগতিশীল কর্মসূচীতে তিনটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি একান্ত জরুরী।

(১) ভূমি ব্যবস্থা থেকে সামন্তবাদের অবশেষগুলোকে নির্মূল করা। খোদ সরকারী কর্মকর্তারা পর্যন্ত যাকে উৎপাদনবিরোধী ও অপচয়-মূলক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন সেই বর্গা প্রথার বিলোপ সাধন। আশু পদক্ষেপ হিসেবে অতন্তঃপক্ষে বর্গা সত্ত্বের স্বীকৃতিসহ বর্গা প্রথার যথোপযুক্ত সংস্কার। মহাজনী ঋণের শোষণের জোয়াল থেকে কৃষক-দের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা।

(২) ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন। বর্তমান একশ' বিঘা জমির সিলিং কড়াকড়িভাবে কার্যকরী করা। জমির সিলিংকে ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা ও উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে সমবায় গঠনের শর্তে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বণ্টন করা।

(৩) ক্ষেত মজুর ও ভূমিহীন কৃষকসহ সকল স্তরের কৃষকদের নিয়ে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে কৃষি সমবায় গড়ে তোলা। সমবায়গুলোতে জমি ও শ্রমের জন্যে উৎপন্ন ফসলের আলাদা অংশ নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমে জমির অংশ হ্রাস ও মজুরির অংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। কৃষি সমবায়গুলোকে সস্তা দরে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সার বীজ সেচের উপকরণ কীটনাশক প্রভৃতি ইনপুট এবং ঋণদানের ব্যবস্থা করা। কৃষিতে ধীরে ধীরে যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া।

॥ ৫ ॥

আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশে আরেকটি গুরুত্বপর্ণ ও বিতর্কিত বিষয় বৈদেশিক ঋণ।

একথা স্বীকার্য যে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সঞ্চয় হারের নগণ্যতার দরুণ বর্তমান অবস্থায় বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। প্রথমতঃ বৈদেশিক ঋণকে অবশ্যই হতে হবে রাজনৈতিক শর্তমুক্ত। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্খা ও পছন্দ অনুযায়ী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিরঙ্কুশ অধিকারকে যেন তা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না করে। দ্বিতীয়তঃ স্বল্পমেয়াদী সুবিধার খাতিরে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর অহেতুক ঋণের বোঝা যেন চাপিয়ে দেয়া না হয়। ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে অপচয়মূলক ভোগে যেন ব্যয়িত না হয়। তৃতীয়তঃ বৈদেশিক ঋণ যেন প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ও দেশের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনোলজি আমদানীর পথ প্রশস্ত না করে। চতুর্থতঃ বৈদেশিক ঋণ যেন স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়ক হয় এবং বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের উপর নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে না তোলে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমরা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করেছি। অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের বার্ষিক

উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয়ের শতকরা ৮০/৯০ ভাগই বৈদেশিক ঋণ। অনেক সময় আমরা ১৫০০ কোটি টাকা সাহায্য ও ঋণ পেয়ে উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় করেছি ৮০০/৯০০ কোটি টাকা। এসব উদ্বেগজনক তথ্যের আলোকে আমাদের বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ঘাটতি একটা বিরাট সমস্যা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের আমদানীর চাহিদা বেড়েছে। এর সাথে সাথে আমদানী পণ্যের দর অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধির ফলে আমদানী বাজেট কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে আমাদের রপ্তানি পণ্যের দর বাড়েনি বললেই চলে। ফলে আমদানী-রপ্তানির ফারাক রীতিমত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্য আমদানীর চাহিদা হ্রাস ও রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধির দরুণ পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলেও আমদানী ব্যয় রপ্তানি আয়ের তিনগুণের কম হবে না। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্যে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে, রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রচলিত পণ্য ও প্রচলিত বাজারের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়াতে হবে। এর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাঁচা মাল রপ্তানিকারী উন্নয়নগামী দেশগুলোর স্বার্থরক্ষার দাবীতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে একযোগে লড়তে হবে।

॥ ৬ ॥

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জনশক্তি। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, জনশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়েই আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে হবে।

দেশের উন্নয়নের জন্যে চাই কাজ, নিরলস কঠোর পরিশ্রম। আমাদের বিপুল জনশক্তি আছে, কিন্তু নেই তাদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা। জনশক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশই বেকার বা আধা বেকার। তদুপরি বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) মেয়াদকালে ৪০ লাখ কাজ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিল। পরিকল্পনা প্রণেতারা হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, এ লক্ষ্য পূরণ হলে পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা বাড়বে না। কর্মবিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে প্রধানতঃ জোর দেয়া হয়েছিল কৃষির অধিক ফলনশীল বীজ-নির্ভর টেকনোলজি ব্যাপকভাবে চালু করার উপর। অর্থাৎ অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার বাড়ানো গেলে কৃষিতে শ্রমের চাহিদা তথা কর্মসংস্থান বাড়বে। পরিকল্পনা মোতাবেক তা না হওয়ার দরুণ কর্মসংস্থানও আশানুরূপভাবে বাড়েনি। শিল্প, সেবা শিল্প প্রভৃতি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে নি বললেই চলে। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত মানুষের তো কথাই নেই, বহু উচ্চ শিক্ষিত যুবক পর্যন্ত বেকারের অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বহু ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ কর্মজীবী দেশে কাজ না পেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে।

দেশে শিল্পায়নের যে গতি তাতে শিল্প খাতে দেশের বিপুল বেকার জনশক্তিকে কাজে লাগানোর আশু সম্ভাবনা সামান্যই। কাজেই কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প প্রভৃতি খাতেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেও জোর দিতে হবে শ্রমঘন, ইন্টারমিডিয়েট টেকনোলজির উপর। আমাদের আছে অপর্যাপ্ত শ্রমশক্তি, অভাব পুঁজির। কাজেই পুঁজির অভাবে জনশক্তিকে বেকার বসিয়ে না রেখে শ্রম দিয়ে পুঁজির ঘাটতি মেটাতে তৎপর হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

পরিশেষে আমরা জোর দিতে চাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দক্ষতা ও কমিটমেন্ট এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতার উপর। পশ্চাৎপদতা ও পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাধীন স্বনির্ভর ও সমাজতন্ত্র অভিমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী এক কথায় ব্যাপক জনগণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জনগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করে কাজে লাগানো রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সফলতার মানদণ্ডে যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা বিচার্য তেমনি এর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি বা পশ্চাদপসরণ।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য চাই

অজয় রায়

১৯৫২-র পর ২৫ বছর অতিক্রান্ত। ২৫ বছর আগে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তা শুধু সমসাময়িক ঘটনার গতিধারাকেই প্রভাবিত করেনি, দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তা জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাপ রেখে আসছে। প্রতিটি সংকট মুহূর্তে আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি এবং পেয়েছিও। ২১শে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য নতুন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে প্রতিবার।

২১শে ফেব্রুয়ারীর সংগ্রাম ভাষার দাবীতে হলেও তা সেদিন জাতীয় সত্তার বিকাশ ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিককেই প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক ভাবে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীগুলি ক্রমে যেমন সুস্পষ্ট অবয়ব পেতে শুরু করে, তেমনি আমাদের সাহিত্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এর ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশ, তার অতীত, বাঙালীর জীবন, তার বিভিন্ন সমস্যা

প্রভৃতিকে উপজীব্য করে সাহিত্য চর্চায় নতুন জোয়ার দেখতে পাই আমরা। শুরু হয় এসব বিষয়ে আলোচনা। এ প্রসঙ্গে রেনেসাঁ কথাটা ব্যবহার করা যায় কিনা জানি না। তবে এক নতুন চেতনা গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলে। সে উজ্জীবনের মূল কথা— বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প, তার অগ্রগতি ও বিকাশের দাবী। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে অনেকটা হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি এগিয়ে চলে। সবকিছু মিলে যে আবেগ ও ধারার সূচনা সেদিন হয় তার প্রভাব ছিল গভীর, জাতীয় মানসের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল।

আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস যদি রচনা করতে হয় তাহলে বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারীকে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তারিখ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। তার আগের অবস্থাটা কি? আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই ঢাকা শহরেই 'শিখা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের নেতৃত্বে যে 'বুদ্ধির মুক্তির' আন্দোলন হয় তার তাৎপর্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও বলা চলে যে, জাতীয় জীবনে এমনকি শিক্ষিত সমাজেও তার প্রভাব খুব বেশী একটা পড়েনি। তাছাড়া রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপ সংযোগ না থাকায় যে সমস্যাগুলি তখন বাস্তব জীবনকে আলোড়িত করেছে সে ব্যাপারে তাঁদের কোন বক্তব্য ছিলনা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পরিমণ্ডলে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু উপরোক্ত কারণে সেদিন নিছক মুক্তবুদ্ধির চর্চাও মুষ্টিমেয়ের বাইরে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

পরবর্তীকালের ইতিহাসও আমাদের পক্ষে খুব শ্লাঘার বিষয় নয়। এদেশের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে দেশের বেশীর ভাগ খেটে-খাওয়া মানুষের কথাকে উপজীব্য করে নজরুল যে ধারার সূচনা করলেন তাও বেশীদূর এগুলোনা। গ্রাম্য জীবন, গ্রামের মানুষগুলির দুঃখ বেদনা আশাকে নতুন করে তুলে ধরলেন জসীমউদ্দিন। শিক্ষিত

সমাজ এক নতুন দুনিয়ার সন্ধান পেলেন। তার আগে ময়মনসিংহ গীতিকার অপূর্ব গাথাগুলি ছেপে বের হয়েছে। মনসুরউদ্দিনের 'হারামনি' ধারাবাহিকভাবে বের হতে শুরু করেছে 'প্রবাসী'তে। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের গবেষণার ফলে বিরাট পুঁথিসাহিত্যের সাথে কিছু কিছু পরিচিত হয়েছি আমরা। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিবৃত্তও তখন আর অজানা ব্যাপার নয়। অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্য ও লোক-মানসের অপূর্ব সৃষ্টিগুলি সম্পর্কে নতুন করে জানা-বোঝার পালা তখন শুরু হয়েছে। জসীমউদ্দিন সেই ঐতিহ্য ও লোক-মানসের অপূর্ব সৃষ্টিগুলির ধারাতেই নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু সে ধারাও যেন সাময়িক ভাবে মরুপথে হারিয়ে গেল। কারণ প্রশ্ন তখন অন্যত্র। প্রশ্ন—প্রাথমিকভাবে আমরা বাঙালী কিনা? ঐতিহ্য আমাদের কি? ঐতিহ্য কি এদেশের মাটিতেই সন্ধান করতে হবে, না এককালের বাগদাদ, পারস্য বা মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যকে দেশজ ঐতিহ্যের সাথে সমমর্যাদায় রেখেই বিবেচনা করবো? এ ব্যাপারে তখন দ্বিমত ছিল এবং প্রবলতর ছিলেন তাঁরাই যাঁরা —আমরা প্রাথমিকভাবে বাঙালী একথাটা অস্বীকার করতে চাইতেন! সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা যে ধারার সূচনা করলেন সেটাই তখনকার মতো প্রবলতর হয়ে উঠলো। এ সাময়িক উত্তেজনাই প্রাধান্য পেল সে সময়।

সাতচল্লিশের পরও অবস্থার পরিবর্তন হলো না। তখন নতুন নতুন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্ররা অবশ্য আটচল্লিশেই রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাঙলার দাবী উত্থাপন করেছেন। এদিক-ওদিক দু-একটি সাহিত্য পত্রিকায় বা এক-আধটি সম্মেলনে দেশের দিকে, দেশের লোক-জীবনের দিকে মুখ ফেরাবার কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে সত্য, কিন্তু প্রধান ধারা তখনো ভিন্ন। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের দিকে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের বক্তব্যই তখন পর্যন্ত প্রধান। বস্তুতঃপক্ষে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষার দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কেও তখন পর্যন্ত জনমনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রভাষা

হিসেবে বাঙলার দাবী রাষ্ট্র-বিরোধী, এমন অদ্ভুত চিন্তাতেও আস্থাবান ছিলেন অনেকেই।

কিন্তু বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর অবস্থা পুরোপুরি বদলে গেল। শাসক কর্তৃপক্ষ ও তাদের যারা পায়রবী করতেন তারা যাই বলুন না কেন, অন্যদের আস্থা যেন রাতারাতি পাল্টে গেল। রাজনীতির ক্ষেত্রে এর ফলে কি পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় সে ইতিহাস সুবিদিত। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। কবিতা, ছোটগল্প প্রবন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ সময় থেকে একদিকে যেমন সৃষ্টির প্রাচুর্য্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি যে বিভ্রান্তি কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানস জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যে বিভ্রান্তি আমাদের জাতীয় পরিচয় ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে তার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম শুরু হয়। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত চর্চা এবং সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। শহীদ আলতাফ মাহমুদের একুশের গান জনমনকে আলোড়িত করে। এক হিসেবে জহির রায়হান একুশেরই সৃষ্টি। শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার, শহীদ মুনীর চৌধুরী প্রমুখরা তো একুশ থেকেই তাদের যাত্রা শুরু করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই নতুন প্রাণবন্যার স্বাক্ষর আমরা দেখি ১৯৫৩-র কুমিল্লা সাহিত্য সম্মেলনে ও ১৯৫৪-র ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনে। দুটি সম্মেলনই ছিল সারা বাংলাদেশভিত্তিক। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এই সম্মেলন দুটিতে যোগ দিয়েছিলেন। এর মাঝে ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা তখন সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই এই সম্মেলনে যোগ দেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আবদুর রহমান খাঁ। প্রাক্তন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দিন সাহেবও একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ শহীদুল্লাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এ সময়। বেশ কয়েকদিনের সম্মেলনের

পর সর্বসম্মত একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। সে ঘোষণার মূল কথাই ছিল—আমরা বাঙালী, বাঙলা সাহিত্যের প্রবহমান ঐতিহ্য আমাদের ঐতিহ্য, এ দেশের মানুষের জীবন, তার সুখ-দুঃখ বেদনা, তার চিন্তা-চেতনা জীবন-চর্চাই এদেশের সাহিত্যের উপজীব্য। মোটামুটি একই চিন্তা-চেতনার উপর ভিত্তি করেই ১৯৫৬ সালে কাগমারীতে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনের ঠিক পর পরই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এ দেশের জনতার অভূতপূর্ব বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারী করে নবনির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দেন। হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী কারারুদ্ধ হন। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের কর্মীরাও রেহাই পান না। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীলও গ্রেফতার হন এ সময়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বাভাবিক কারণেই সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। বস্তুতঃপক্ষে পাকিস্তান আমলে এদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন কোন সময়ই বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৫২-র পর ১৯৫৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় যে সংকলনটি প্রকাশিত হয় কিছুদিনের মধ্যেই সরকার থেকে তার প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। পাকিস্তানী শাসনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এ ধরনের দমন নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপর দমন নীতির পাশাপাশি নানা ধরণের প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টাও আগাগোড়াই সরকারের ছিল। আরবী বা ল্যাটিন হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫৮ সালের পরবর্তীতে যখন সামরিক শাসন জারী করা হয়, তখন শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারী বা অনুরূপ দিবস উদ্‌যাপনই নয়, বাংলা সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতো। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত নন, তিনি বিদেশী, ১লা বৈশাখ বিজাতীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি এ সময়েই সরকারী মহল থেকে জোরে-

সোরে তোলা হয়। সরকারী উদ্যোগে এ ব্যাপারে পেটোয়া লোকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে, বিবৃতি সংগঠিত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় এ সব কথা।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মত সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এ দেশে সরকারী দমন নীতি ও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেই অগ্রসর হয়েছে। সরকার রবীন্দ্র-বর্জনের আহবান জানালেন, এ দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলেন। উনসত্তুরের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মাস দুই তিন আগে ঢাকায় অন্যান্য কবিদের সাথে স্মরণ করা হলো রবীন্দ্রনাথকে, মাইকেলকে, নজরুলকে। সরকারী বাধার জন্যেই ১লা বৈশাখ অনুষ্ঠান জাতীয় সত্তার অভিব্যক্তি ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হলো। বাংলা হরফের পরিবর্তনের বিরোধিতা করলেন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা, উনসত্তুরের গণ-আন্দোলনে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ।

সরকারী দমন নীতি ও প্রতিকূলতার জন্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীরা কোন সময়ই একটানাভাবে বাধামুক্ত পরিবেশে খোলাখুলি কাজ করতে পারেন নি। কোন কথা বলা যাবে, কি লেখা যাবে তা নিয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হতো তাদের। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে সরকারী উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নানা ধরনের প্রশ্ন তুলে জাতীয় চেতনা ও বিকাশকে খর্ব করার চেষ্টা করা হতো সচেতনভাবে। বুদ্ধিজীবীরা দমন নীতিরও শিকার হতেন বার বার। এ সব কারণে স্বাধীনতার আগে কোন সর্বাঙ্গীন সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি এদেশে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, স্বাধীনতার আগে 'মাসিক মোহাম্মদী'র মত তথাকথিত পত্রিকা ছাড়া কোন সাহিত্য পত্রিকা সরকারী আনুকূল্য পায়নি। একটি বা একাধিক সাহিত্য পত্রিকাকে ঘিরে সাহিত্য আন্দোলন যে দানা বাঁধবে তা সম্ভব হয়নি, কারণ স্রেফ বেসরকারী উদ্যোগে কোন সাহিত্য পত্রিকাকে টিকিয়ে রাখা এদেশে যে কি কঠিন তা যাঁরা

পত্রিকা চালান তাঁরাই জানেন। সে সময় কোন জাতীয় আর্ট গ্যালারী বা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি— এ ব্যাপারে বার বার দাবী তোলা সত্ত্বেও। যে লোক-সাহিত্য বা লোক-সঙ্গীতকে নিয়ে প্রয়োজন মাফিক হৈ-চৈ করা হয়েছে সে ব্যাপারে গবেষণা বা সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়নি কোন একাডেমী। যেটুকু উদ্যোগ হয়তোবা নেয়া হয়েছে তাও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সমস্ত জিনিষটাকে বিকৃত করে দেখানোর উদ্দেশ্যে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, লালনকে নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য লালন বা বাউল সঙ্গীত সাধনার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে যথাযথ গবেষণা নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে লালনকে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিই ছিল সে প্রয়াসের উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক ২১ দফার অন্যতম দাবী ছিল—বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বাঙলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর সে দাবী বাস্তবায়িত হলেও বাংলা একাডেমী যাতে বাঙলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় তুলে ধরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে না পারে সেজন্যে সরকারী শ্যেন দৃষ্টি আগা গোড়াই উদ্যত ছিল।

ইচ্ছে করলে এ জাতীয় তালিকা আরো লম্বা করা যায়। সে সময় যাঁরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য। নিপীড়িত জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের আকাঙ্খার অঙ্গ হিসেবেই পাকিস্তানী আমলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্বাভাবিক ও বোধগম্য কারণেই রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেছে। সে সময় তার ভেতর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সুরটাই ছিল প্রধান। কারণ তখন লড়াই করতে হচ্ছিল প্রতিকূল ও বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। সে জন্যে সব সুরই ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা।

॥ ২ ॥

স্বাধীনতার পর অবস্থা পাল্টেছে। নিজেদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্যে যে রাষ্ট্রশক্তি ইতিপূর্বে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতি চর্চার বিরোধিতা করতো সে রাষ্ট্রশক্তি অপসারিত হয়েছে। অভ্যুদয় হয়েছে বাংলাদেশের।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শতাব্দী-লাঞ্ছিত ও শোষিত জাতিকে সব দিক থেকে গড়ে তোলা স্বাভাবিকভাবেই প্রধান কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে সবার সামনে। ভাঙা-চোরা অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে হবে। দরিদ্র দেশ আমাদের। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এ অবস্থায় প্রধানতঃ জনশক্তিকে ভিত্তি করে দেশের কৃষি, শিল্প প্রভৃতির পশ্চাৎপদতা যেমন কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে, ঠিক তেমনি এদেশের দরিদ্র ও মেহনতী কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের জীবনের দারিদ্র্য ও সংকট দূর করার জন্যে ধাপে ধাপে হলেও বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে এক এক করে। এ আলোচনা ভিন্ন আলোচনা। তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার—যে মুষ্টিমেয় পরশ্রমভোজী আমাদের দেশে আছে তাদের উদর স্ফীত করা নয়, ব্যাপক শ্রমজীবী জনতা যাতে নিজেদের শ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করতে পারেন সেই সুস্পষ্ট লক্ষ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিচালিত না হলে দেশের কোন সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। সে জন্যে সমস্ত উন্নয়ন কাজের লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে সবার সামনে তুলে ধরা দরকার। পূর্বোক্ত সুস্পষ্ট লক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসী বিশেষতঃ দেশের শ্রমজীবী মানুষের সচেতন ও সংগঠিত অংশ গ্রহণের ভেতর দিয়েই এদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বস্তুতঃপক্ষে এদেশ আমাদের সবার। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে নয়, দেশের ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থে এ দেশকে নিজেদের শ্রমে নতুন দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং তার ভেতর দিয়েই সম্ভব হবে এ দেশের দরিদ্র, লাঞ্ছিত, হতভাগ্য জীবনের পরিবর্তন—এই চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত

দেশবাসীর সংগঠিত প্রয়াসই দেশের চেহারা বদলে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার মূল উপাদান। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বের প্রশ্নটি এখানেই এসে পড়ে। কারণ এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন পারে দেশের জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে, সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করে নতুন জীবন গড়ার প্রয়োজনে কঠোর শ্রমে ব্রতী করাতে, প্রতিটি মানুষের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে।

কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা দিক-নির্দেশ ছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। সমাজে পশ্চাদ্‌মুখী শক্তি আজও বিদ্যমান। তারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই পুরানো রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণার পরিপোষক। যে প্রশ্নগুলি পাকিস্তান আমলে তোলা হতো, সেই প্রশ্নগুলি আজও তারা নানাভাবে তুলে ধরতে চান। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার কি—অর্থাৎ অতীত বাঙলা ভাষাভাষী জনসাধারণের তাবৎ মহৎ সৃষ্টি আমাদের উত্তরাধিকার কিনা এবং তার সবটুকুকে আত্মস্থ করেই আজ আমাদের দেশের জনসাধারণ নিজেদের মাতৃভূমিতে নতুন জীবন গড়ে তুলবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চান। এই ভদ্রলোকেরা কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহক। অর্থনীতিতে এঁরা ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের বিনিময়ে মুষ্টিমেয়ের উদরস্ফীতির সপক্ষে। অন্যদিকে এই শক্তিগুলি আমাদের এতদিনের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সর্বোপরি স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি কটাক্ষ করেন, তার সুফলগুলিকে নস্যাৎ করতে চান। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙলা ভাষার চর্চার সরাসরি বিরোধিতা সম্ভব নয়। এঁরা ঘুরিয়ে তা করতে চেষ্টা করেন। অফিস-আদালতে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, বাঙলা প্রচলনে অনীহা প্রকাশ করেন, নতুন করে সরকারী অফিসে ইংরিজি প্রচলন করতে চান। ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিও এঁরা কটাক্ষ করতে ছাড়েন না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম করে জনজমায়েত করে সেখানে দাবী তোলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলতে, আলবদর-রাজাকারদের দেশপ্রেমিক বলে ঘোষণা করতে। পাকিস্তানী শাসকদের আনুকূল্যে যে শক্তিগুলি ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থ

সংরক্ষণ করছিলেন তারাই এ ধরনের আওয়াজ তুলতে চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতাকে ব্যবহার করে এবং রক্ষণশীল চিন্তাধারাকে উস্‌কে তুলে এঁরা আসর জমাতে চান। সংস্কৃতি চর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ধারাকে প্রতিহত না করে অগ্রগতি যে সম্ভব নয়, সে কথা সহজেই বোঝা যায়। অতীতের জের হিসেবে সমাজে এঁরা আজও টিকে আছেন। অতীতের মতই আজও এদের মোকাবিলা করতে হবে। একই সাথে যারা দেশের জনসাধারণ, তাদের ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনাকে বাদ দিয়ে নিজেদের চেতনা থেকে এদেশের জনতার উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চান তারাও এদেশের মানুষের কোন কল্যাণই যে করতে পারবেন না এবং সেজন্যে তাদের সে প্রয়াসও যে বর্জনীয় সে কথাও উপলব্ধি করতে হবে।

বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আবিষ্কৃত ইতিহাসের পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সে ইতিহাস থেকে যে সত্যটি সুষ্ঠুভাবেই বেরিয়ে আসে তা হলো,—এদেশের সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলির উৎস এদেশের জনজীবন, তাদের শ্রম, চেতনা ও জীবন-চর্চা। বৌদ্ধ দোঁহা হোক, আরাকান রাজসভার আনুকূল্যে লিখিত কাব্যই হোক, মঙ্গল কাব্য অথবা বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত পদাবলীই হোক—এদেশের সাহিত্যের যে ধারাটিকে নিয়ে আমরা সাধারণতঃ গৌরব করে থাকি সে ধারাটির সাথে জনজীবন, তাদের জীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম, তাদের ধ্যান-ধারণার যোগসূত্র খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃপক্ষে প্রাচীন বা মধ্যযুগের অনেক সাহিত্য-কীর্তির স্রষ্টাও জনসাধারণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে ময়মনসিংহ গীতিকা, বাউল, ভাটিয়ালী বা দেহতত্ত্বের গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাঙালীর শিল্পচর্চার যেটুকু নিদর্শন কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে আজও টিকে আছে সেটুকু থেকেও আমাদের শিল্পীদের সাথে জনজীবনের যোগাযোগটুকু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়পুরের অপূর্ব মৃৎ-ফলকগুলির কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে এই শিল্পীরা ছিলেন জনতারই শিল্পী। উনবিংশ শতকে ইংরিজি শিক্ষা প্রচলনের পর বাঙলা ভাষা চর্চা, সাহিত্য সৃষ্টি ও সংস্কৃতির

বিভিন্ন শাখায় যে অগ্রগতি দেখা যায় তার সাথে ব্যাপক জনজীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে উদার মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরে এই ধারা পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এই ধারার কাছে ঋণ আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। বর্তমান বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। বাঙলাভাষী হিসেবে বাঙলা ভাষাভাষী সমস্ত জনতার সুকৃতিই আমাদের উত্তরাধিকার। বৌদ্ধ দোঁহা হোক, মধ্যযুগের রোমান্টিক সাহিত্যই হোক, পুঁথি সাহিত্যই হোক, আর রবীন্দ্রনাথ—নজরুলই হোক, ময়মনসিংহ গীতিকা অথবা লালন গীতি যাই হোক না কেন —যা যুগে যুগে এ দেশের জনমনকে অনুপ্রাণিত করেছে, সুখে-দুঃখে জীবন সংগ্রামে উদ্দীপিত করেছে তার কোন কিছুকেই আমরা বাদ দিতে পারিনা। তা বাদ দেয়ার অর্থ নিজেদেরই দরিদ্র করা। বরঞ্চ সবার সারাংশটুকু আত্মস্থ করেই এদেশের ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড়িয়েই ভবিষ্যতের বুনিয়াদ আমরা গড়ে তুলতে পারব। এ দেশের মানুষ তারাই যারা এদেশে বংশ পরম্পরাক্রমে বসবাস করেছেন। তাদের সবার জীবন-চর্চা, অনুভূতি, প্রেরণা সৃষ্টিই এদেশের ঐতিহ্য —এই সহজ সরল সত্যটাকে অস্বীকার করা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই কোন জনগোষ্ঠী যেহেতু অপর জনগোষ্ঠী থেকে চীনের প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু একের প্রভাব অপরের উপর পড়া স্বাভাবিক। জীবন-চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই জীবন-চর্চা বা চিন্তা-চেতনায় বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পর্য্যায়ে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্যনীয়। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে অন্য জনগোষ্ঠীর প্রভাব বা ধর্মীয় আচার আচরণই সংস্কৃতি চর্চার একমাত্র বিচার্য্য ব্যাপার নয়। সবকিছু মিলে-মিশে যে দেশজ রূপটি সৃষ্টি হয় সেটিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই দেশজ উত্তরাধিকারের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপরই আমাদের ভবিষ্যত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইমারত গড়ে উঠবে।

আগেই বলেছি, আপামর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আর যাই হোক ব্যাপক জনজীবনকে আলোড়িত করতে পারবেনা। এই সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সর্বশেষ বিচারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে অর্থাৎ সমাজে ও চিন্তা জগতে রক্ষণশীলদের প্রাধান্য টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

এ দেশকে নতুন করে গড়তে হবে, নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে এ দেশের প্রতিটি মানুষকে। বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এটাই লক্ষ্য এবং এর চেয়ে মহত্তর লক্ষ্য আর কিছু হতে পারেনা। এদেশের প্রতিটি অখ্যাত, অজ্ঞাত মানুষকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা দেশের সবার সাথে সাথে নিজের জন্যেও নতুন জীবন গড়ে নিতে পারে। এই নতুন জীবন গড়ার জন্যে শ্রম, ত্যাগ ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হবে নতুন মানুষ, তাদের নতুন জীবনবোধ।

পুরানো সমাজ ক্ষয়িষ্ণু হলেও আমাদের দেশে আজও টিকে আছে। বহু পুরানো, দূষিত, গলিত অভ্যাস, চিন্তা-চেতনা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এটা সত্য, আমরা একটা মুক্তিযুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছি। তাতে তিরিশ লক্ষ ভাই-বোন শহীদ হয়েছেন। স্বাধীনতার আগে আত্মাহুতি দিয়েছেন এদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। তারও আগে বরকত-সালাম সহ বহু শহীদের রক্ত এদেশের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার ভেতর দিয়ে এ দেশ আমাদের, আমাদেরই ত্যাগ আর শ্রমে এদেশকে গড়ে তুলতে হবে—এই দেশ প্রেমিক চিন্তায় কি সবাইকে সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলা সম্ভব হয়েছে? পুরানো ঔপনিবেশিক সমাজের অবদান দুর্নীতি সমাজ-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট। তার বিরুদ্ধে সেই জ্বলন্ত ঘৃণা কোথায়? শ্রম এবং আমাদের সবার সংঘবদ্ধ শ্রমই একমাত্র এদেশের আদল বদলে দিতে পারে। কিন্তু পরশ্রমভোজীরা আজও সমাজে সম্মানিত এবং শ্রমজীবীরা অবহেলা ও উপেক্ষার পাত্র। আমরা সবাই জানি আমাদের বিদ্যালয়-

গুলিতে আগামী দিনের কারিগররা শিক্ষা লাভ করছে। কিন্তু তাদের দেশপ্রেম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা অথবা শ্রমের প্রতি যথোপযুক্ত মনোভাব গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কি?

সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা উঠতে পারে। বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর এ দেশের, এ জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসেবে যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের পর নতুন দেশ গড়ার জন্যে নতুন মানুষ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সেই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। সেজন্যে যেমন অতীতের উত্তরাধিকারের দৃঢ় ভিতের উপর পা রাখতে হবে, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতের মানুষ গড়ে তোলার জন্যে উপরোক্ত প্রশ্নগুলিরও মোকাবিলা করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষ বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা কর্মকাণ্ডের কথা ভাবা যায় না।

।। ৩ ।।

এবার স্বাধীনতার পরের অবস্থাটার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। স্বাভাবিকভাবেই এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাই প্রধান। কাজেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশ্নে তাঁদের ভূমিকাটিই প্রধান বিচার্য্য।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জনগণের অপেক্ষাকৃত সচেতন অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবীরা আরো বেশী দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবেন এটা আশা করাটাই স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কিছুটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কিছুটা মুষ্টিমেয়ের অধিক মুনাফার লালসা, কিছুটা সরকারী ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে জনজীবনের সঙ্কট দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রভাবশালী সমাজে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারের ফলে দুর্নীতিই যেন স্বীকৃত—এরূপ ভাব সৃষ্টি হয়। তরুণ সমাজ, যুব শক্তির সামনে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ না থাকায় তাদের

একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হাইজ্যাকিং, ছিনতাই প্রভৃতিতে জড়িয়ে পড়েন। এদেশ, এ জাতিই যে এক সময় ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একসাথে গর্জে উঠেছিল সে কথাটা যেন বিস্মৃতিতে পর্যবসিত হতে চায়। সমস্ত দেশ যেন কালোবাজারি, মুনাফাখোরদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঢাকার রাজপথে আবার নিরন্নের মিছিল দেখা যায়। দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় হাজার হাজার দেশবাসী।

উপরে যে অবস্থার কথা বলা হলো আমরা সবাই সে সময় অতিক্রম করে এসেছি। বাস্তব জীবনের পেষণে নিতান্ত জীবন ধারণ যেখানে অসম্ভব হয়ে পড়ছে তখন ধৈর্য্য ধরা বা সমস্ত জিনিসটাকে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখতে পারাটা যে খুবই কঠিন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা তো সমাজের সচেতন অংশ। সমাজের পূর্বোক্ত অবস্থা সত্ত্বেও নতুন জীবন গড়ারও যে একটা আয়োজন বা প্রচেষ্টা স্বাধীনতার পর থেকেই ছিল সেই সত্যটা দেশবাসীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এটা আশা করা যায় না। স্বাধীনতাকে সংহত করা, দেশের বেশীরভাগ মানুষের জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে কর্মোদ্যোগ সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা চলছিল তাতে যোগ দেবার জন্যে দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করবেন এটাই ছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

আজও বুদ্ধিজীবীদের পূর্বোক্ত দায়িত্বের পরিবর্তন হয়নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর প্রভৃতি তারিখগুলির তাৎপর্য্য ম্লান করে দেয়ার জন্যে রয়েছে মহল বিশেষের সংগঠিত উদ্যোগ। অন্যদিকে রয়েছে নিজেদের শ্রমে, প্রধানতঃ নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভর করে দেশের প্রতিটি মানুষের ভাগ্য বদলে দেবার দায়িত্ব। এই দুই ক্ষেত্রেই সমগ্র দেশবাসীর কর্মোদ্যোগকে জাগ্রত করা দরকার। আর এখানেই বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব—সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও বর্তমান কর্তব্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমস্ত কর্মী উপরোক্ত প্রয়োজনে দেশপ্রেমের নতুন চেতনায় সচেতন করে তুলবেন দেশবাসীকে—এই প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক।

এজন্যে একদিকে যেমন নিজেদের উত্তরাধিকারকে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে সবার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে, আবার অন্যদিকে ব্যাপক জনতার সৃষ্টি-ক্ষমতার উৎসমুখ খুলে দেবার জন্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সচেতনভাবে দেশের আপামর জনতার মাঝে বিস্তৃত করে দেবার চেষ্টা করতে হবে। জনসাধারণের ভেতর থেকে, এ দেশের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার ভেতর থেকে নতুন বুদ্ধিজীবীরা এভাবেই জন্ম নেবেন। জনগণের সাথে নাড়ীর সম্পর্কে সম্পর্কিত বুদ্ধিজীবীরা যদি দলে দলে বেরিয়ে না আসেন, ব্যাপক সৃষ্টি কাজে যদি তাঁরা উদ্যোগী হয়ে না ওঠেন তাহলে যে ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা আমরা বলতে চাইছি তা সম্ভব হবে না। সম্ভব হবেনা সমস্ত ধরনের পশ্চাদ্‌মুখীন চিন্তাধারা, রক্ষণশীলতা, কুসংস্কারকে প্রতিহত করে দেশপ্রেমের নতুন চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

সেজন্যে বাস্তবভাবে প্রথমেই যে কাজটি জরুরীভাবে হাতে নেয়া দরকার তা হলো নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান। আমাদের শিক্ষক-সমাজ ও ছাত্ররা এ কাজ সহজেই হাতে নিতে পারেন। উদ্যোগী হতে পারেন বুদ্ধিজীবীরা। ব্যাপক জনতাকে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করার সাথে সাথে দেশ ও দশের পরিস্থিতির সাথে পরিচিত করে তুলতে পারেন এভাবে। নিরক্ষরতার সুযোগে পশ্চাদ্‌মুখী রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনাকে জনমনে দৃঢ়মূল করার জন্যে একটানা প্রচেষ্টা বিদ্যমান। তা কাটিয়ে তুলে সমগ্র জনগণকে যদি নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত করতে হয়, তাহলে নিরক্ষরতা-বিরোধী অভিযান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, এ পদক্ষেপ ছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার আশা করা যায় না।

তার সাথে সাথে স্বাধীনতা উত্তর পরিবর্তিত প্রয়োজন ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার। এটা ঠিকই এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগই প্রধান ভূমিকা পালন করবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আমাদের শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে শিক্ষা দেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে

তুলতে উদ্দীপ্ত করেন তা হলেও বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও ফলপ্রসূ হতে পারে।

ঠিক একইভাবে দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি, ছাত্র-কিশোর সংগঠনগুলি পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার জন্যে উদ্যোগ নিতে পারে। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্তের সাথে পরিচিত করে তুলতে পারেন সবাইকে।

এ কাজগুলি খুবই সাধারণ বা আটপৌরে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার সৃষ্টির জন্যে এই আটপৌরে পদক্ষেপগুলি অপরিহার্য।

আর সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গণ্ডী নাগরিক জীবনের ক্ষুদ্র-ভগ্নাংশের চৌহদ্দির বাইরে ছড়িয়ে দেবার জন্যে লোক-সংস্কৃতির যে ধারাটি বর্তমানে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার পুনরুজ্জীবন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান ধারার সাথে তার সংযোজনের জন্যে সচেতন উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন এ দেশের জনজীবনের প্রতিটি দিককে ফুটিয়ে তোলার জন্যে ব্যাপক সৃষ্টি-তৎপরতা, সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য। এ কাজ সহজ নয়। সমাজের কায়েমী স্বার্থ, রক্ষণীলতার বাহক শক্তিগুলি একাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সেই বাধা অতিক্রম করেই সম্ভব হবে 'জনতার মানবিক ও আত্মিক বিকাশ এবং সুস্থ চিত্ত বিনোদন ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জাতীয় সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক বিকাশ।'

সেই লক্ষ্যে সব খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ একত্রিত করে শুরু হোক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নতুন জোয়ার। পঁচিশ বছর আগে একুশে ফেব্রুয়ারী যে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, পঁচিশ বছর পর আবার একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে নতুন দায়িত্ব সামনে রেখে নব পর্যায়ে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হোক, নতুন দেশ ও নতুন মানুষ গড়ে তোলার দৃপ্ত শপথ হোক এ পর্যায়ের অঙ্গীকার।

অপুঁজিবাদী পথ ও সমাজতন্ত্র

মতিউর রহমান

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা মনীষী কার্ল মার্কস রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর নেত্রী ভেরা জাসুলিচকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “পুঁজিবাদের গর্ভযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সকলকে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই।” মনীষী কার্ল মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজকের বিশ্বে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকার অনেকগুলো রাষ্ট্রই ‘পুঁজিবাদের গর্ভযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে’ না গিয়ে সমাজ-বিকাশের উন্নত পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। “তরুণ স্বাধীন দেশগুলিতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিগুলি ক্রমেই বেশী করে পুঁজিবাদ বরদাস্ত না করার অবস্থান গ্রহণ করছে।”

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতোই এক অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। শতাব্দীর শোষণ আর নিষ্পেষণের ফলে বাংলাদেশে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান চরম দুর্দশা আর সংকট। বহু আত্মত্যাগের

ফলে অর্জিত আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরেও দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে কোন মৌলিক পরিবর্তন এখনো ঘটেনি। মেহনতী শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতির জীবনে সুখ-শান্তি আসেনি। বরং বহু ক্ষেত্রেই সমস্যা সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে, হতাশা বেড়েছে। এটা আজকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন তথা অর্থনৈতিক মুক্তি স্বতঃস্ফূর্ততার পথে সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াই অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। এই লড়াইয়ে জয়লাভ করার জন্য প্রয়োজন জনগণের সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা। এই অর্থনৈতিক লড়াইয়ের মূল ও প্রথম কথাই হলো স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলা।

কিন্তু স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলা কোন লক্ষ্যে? 'পুঁজিবাদের গর্ভযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে' গিয়ে—না মনীষী কার্ল মার্কসের সূত্রায়িত সংজ্ঞার বক্তব্য অনুযায়ী 'পুঁজিবাদের গর্ভযন্ত্রণা' এড়িয়ে, সেটাই হল প্রশ্ন।

মুক্তি কোন পথে?

বহু শতাব্দীব্যাপী শোষিত-নিপীড়িত দেশগুলো আজকে যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তখন তাদের সামনে বহু জটিল ও কঠিন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাটি হল স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলার সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশের বহু রাজনীতিবিদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো নিয়তির বিধান হিসেবেই পুঁজিবাদকে আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করবে—এই সব দেশ তাদের কাঁচা মাল যোগান দেবে। পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা ভেবেছিল যে, এই সব দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ, শ্রমিক শ্রেণী আদৌ নেই বা থাকলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র, শ্রেণী সচেতন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠনের অবস্থাও নেই বা গড়ে ওঠনি—তাই এই সব দেশের আর কোন বিকল্পই নেই। কিন্তু তাদের

সেই তত্ত্ব শুধু ফানুসই ছিল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই ক্রমেই পুঁজিবাদ-বিরোধিতার পথে অগ্রসর হচ্ছে—নানাভাবে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

তাই জাতীয় স্বাধীনতার রাজনৈতিক বিজয়ের পর অতীতের সকল পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে কোন পথে দ্রুত সমাজ-প্রগতির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়—এ প্রশ্নটি বাংলাদেশসহ প্রতিটি সদ্য-স্বাধীন দেশের সামনেই সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তাদের সামনে রয়েছে দু'টি পথ—একটি হলো পুঁজিবাদ আর অপরটি অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ।

গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি যদি পুঁজিবাদী পথে অগ্রসর হয়, তবে সে সব দেশের জনগণের জীবন ও জাতীয় ক্ষেত্রের কোন মৌলিক সমস্যারই সমাধান হয় না। এসব দেশের জনগণের মধ্যে একদিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, বেকারত্ব, রোগ বাড়ছে, অপরদিকে নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ পাকাপোক্ত হচ্ছে। এ জন্যই ১৯৬৯ সনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর (৭৫ টি দেশের পার্টি) সম্মেলন অত্যন্ত সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে সদ্যমুক্ত ''যেসব দেশ পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করেছে তাদের সামনের একটিও মৌলিক সমস্যাকে সমাধান করতে সক্ষম হয়নি।''

বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ৮০ কোটি মানুষ অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। অনাহারে, রোগক্লান্ত হয়ে, অশিক্ষার অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই, এল, ও)-এর ১৯৭৫ সনের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মোট কর্মক্ষম লোকসংখ্যার ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ২৮ কোটি মানুষ বেকার, অর্ধবেকার বা অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই দারিদ্র্য, বেকারত্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে উপনিবেশিক অতীতের কাছ থেকে পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর এই হলো প্রকৃত পরিস্থিতি। পুঁজিবাদী পথে তাই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণের ভাগ্যের কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও সংকটের বোঝা বেড়ে চলেছে। বিগত বছরটিতেই এসব দেশে শিল্পোৎপাদন কমেছে, বেড়েছে বেকার ও মুদ্রাস্ফীতি। বিশ্বের পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ৫০/৬০ দশকে যেখানে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ৫ শতাংশ, সেখানে গত সাত বছরে শিল্পোৎপাদন ২ শতাংশ কমেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই. এল. ও)-র হিসাব অনুযায়ী আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, কানাডাসহ উন্নত ধনবাদী দেশগুলোতে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষ। এই হিসাব গত ৪০ বছরে সর্বাধিক। এক বছর আগে বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ, এক বছরে বেকার বৃদ্ধি হয়েছে ১ কোটি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৬ সনে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘটে অংশ নেয় প্রায় ৫ কোটি শ্রমিক। বিশ্বের ২৪টি সবচেয়ে উন্নত ও ধনী দেশকে নিয়ে গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নমূলক সংস্থার (ও ই সি ডি) রিপোর্টে প্রকাশ ঃ "মুদ্রাস্ফীতি রয়েই গেছে এবং গভীর উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে"। এই দেশগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি গড়ে ৭·৫ শতাংশ বেড়েছে খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৯ থেকে ১১ শতাংশ। ১৯৭৬ সনে পুঁজিবাদী দুনিয়ার মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পে মন্দা আর বেকার বৃদ্ধির এই হলো চিত্র। এই যখন খোদ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অবস্থা, তখন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজছে—তার নাভিঃশ্বাস উঠেছে। এই মুমূর্ষু পুঁজিবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর আর কিইবা সমাধান দেবে ?

পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই সংকট প্রত্যক্ষ করে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের মধ্যে এবং তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের নেতাদের মনে পুঁজিবাদবিরোধী মনোভাবের উদ্ভব ঘটছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে—জনসাধারণের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশ গ্রহণ, সর্বস্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকেই তারা পুঁজিবাদের পথ পরিহার করতে চেষ্টা করছে। পুঁজিবাদের গভীর সংকট প্রত্যক্ষ করে এবং

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত উপলব্ধি করে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ ও বহু নেতা সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির দরুন বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের নিকট সমাজতন্ত্রের আবেদন প্রচণ্ড-ভাবে বেড়ে চলেছে। এবং ক্রমেই বেশী করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা আরও উন্নত হচ্ছে। শ্রমিকদের শুধু বেতনই বাড়ছে না, তারা বাসগৃহ, ছুটি, কাজের সময়, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যাপারে নিত্য-নতুন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৩ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর বেতন গড়ে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। সোভিয়েতের প্রায় সর্বত্র কাজের সপ্তাহ করা হয়েছে ৫ দিনে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৫ সনে সোভিয়েতে প্রত্যেক শ্রমিকের গড় বেতন ছিল ১৪৬ রুবল (অর্থাৎ ১৬২০ টাকা)। ১৯৮০ সনের শেষে বেতন বেড়ে হবে ১৭০ রুবল (অর্থাৎ ১৮৮৭ টাকা)। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য শিক্ষা-চিকিৎসা বিনা খরচে দেয়া হচ্ছে। সংস্কৃতি আর ক্রীড়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সর্ব্বোচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতিগত আর বর্ণগত নিপীড়ন নেই। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নতুন সভ্যতা, নতুন জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হচ্ছে—যার লক্ষ্য হচ্ছে সকল মানুষের কল্যাণ, সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ আর বিশ্ব শান্তি।

তাই, তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন অনেকগুলো দেশ 'পুঁজিবাদের গর্ভ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে' না গিয়ে, অর্থাৎ অপুঁজিবাদী পথে এক সমৃদ্ধিশালী নিশ্চিত জীবনের অকাঙ্খায় সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রকেই তাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। ১৯৬৯ সনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সম্মেলনে সিদ্ধান্তাকারে বলা হয়েছিল ঃ "আমাদের সমসাময়িক কালের বৈপ্লবিক অবস্থানসমূহের প্রভাবে নব-স্বাধীনতালব্ধ দেশসমূহের

প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশের স্বতন্ত্র রূপের উদ্ভব হয়েছে এবং বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ভূমিকা জোরদার হয়েছে। কতিপয় নবীন রাষ্ট্র অপুঁজিবাদী পথ বেছে নিয়েছে। এ পথ উপনিবেশিক অতীতের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অনগ্রসরতা দূরীকরণের সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিকাশে রূপান্তরের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এ সব দেশে বহু বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করে সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। এ দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।''

এশিয়া আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ—যেমন, আলজিরিয়া, সিরিয়া, ইরাক, দক্ষিণ ইয়েমেন, গিনি, কঙ্গো, সোমালিয়া, তানজানিয়া, বার্মা প্রভৃতি দেশ অ-পুঁজিবাদী পথ বেছে নিয়ে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের নৃশংস নিপীড়ন ও সীমাহীন শোষণের কবল থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে বিজয়ী রাষ্ট্রত্রয় গিনি-বিসাও, মোজাম্বিক ও এঙ্গোলা 'পুঁজিবাদের গর্ভযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে' না গিয়ে এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের উপর থেকে মানুষের শোষণ চিরতরে নির্মূল করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইথিওপিয়া, বেনিন (প্রাক্তন ডাহোমী), মালাগাছি প্রজাতন্ত্র (মাদাগাস্কার) প্রভৃতি দেশ পুঁজিবাদ-বিরোধিতা ক্রমেই দৃঢ় করে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে স্বাধীনতা-আত্মনির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হয়ে বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে অ-পুঁজিবাদী পথ হয়ে উঠছে সমাজ প্রগতির এক সম্ভাবনাময় রাস্তা।

অ-পুঁজিবাদী পথকে শুরুতেই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের স্তরের সাথে এক করে দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক র, উলিয়ানভস্কির বক্তব্য স্মরণযোগ্য ঃ "বিকাশের অপুঁজিবাদী পথ একটা পৃথক সামাজিক গঠন, অনেকটা যেনো পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি—এই ধারণা রীতিমত অবৈজ্ঞানিক। বাস্তবের সাথে তার মিল সামান্যই, সত্য থেকেও তা বহুদূর।

বর্তমানে আমাদের পৃথিবীতে আছে দু'টি প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন—পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। তাদের একটির উপর নির্ভর করে আরেকটির বেঁচে থাকা বা অন্যোন্যজীবিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দু'টির গঠন বৈরিতামূলক।"

সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মৌল পূর্বশর্তগুলি হলো বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত বুনিয়াদ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন এক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এসব দেশে অপুঁজিবাদী বিকাশ আরম্ভ হয়। সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী হলো শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী প্রকৃত অর্থে গড়ে না উঠলেও সমাজ প্রগতির লড়াইয়ে এসব দেশে মূল ভূমিকা পালন করে শহরের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ছোট মালিক, হস্তশিল্পের কারিগর, ছোট দোকানদার, অফিস কর্মী, সেনাবাহিনী অফিসার, স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা। এরা হলেন উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ। সাধারণভাবে এদেরকেই মধ্যস্তর বলা যায়। এই শক্তি এই সব দেশের রাজনৈতিক জীবনকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। আর অপুঁজিবাদী পথের রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা অধিকাংশই এই সব মধ্যস্তর থেকে আগত। অপুঁজিবাদী পথে অগ্রসরমান দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এটা একটা পৃথক সামাজিক অবস্থা নয়। এই পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থই সমাজতন্ত্র নির্মাণ নয়, বরং তার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তসমূহ (বিষয় ও বিষয়ী) সৃষ্টি করা। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অধনবাদী পথ কোন বিশ্বজনীন ব্যবস্থা নয়—সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর অনেকগুলো সম্ভাব্য পথের এটি অন্যতম।

অপুঁজিবাদী পথ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

পূর্বতন উপনিবেশগুলোতে যে সামাজিক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ অবস্থা বিরাজমান থাকে—এ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সমাজতন্ত্র

বিনির্মাণের কথা চিন্তাও করা যায় না। তাই এ সব দেশে সরাসরি যদি শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেও কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়—সে সরকার প্রথম অবস্থায় যে ধরনের কর্মসূচী অনুসরণ করবে, অপ্রলেতারীয় বা আধা-প্রলেতারীয় কিংবা মধ্যস্তরের বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা অপুঁজিবাদী পথে বিকাশের লক্ষ্যে প্রায় একই ধরনের কর্মসূচী অনুসরণ করে। এ ক্ষেত্রে গরমিল বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই আসলে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর (প্রকৃত অর্থে) গড়ে না ওঠায় অপুঁজিবাদী বিকাশের প্রথম শুরুটা অশ্রমিক বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা করে থাকে। আবার অপুঁজিবাদী বিকাশের অগ্রগতির সাথে সাথে গড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আগেই বলেছি অপুঁজিবাদী বিকাশ মানে সমাজতন্ত্র নয়। আর মেহনতী জনগণের ক্ষমতার কর্তৃত্বই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মৌলিক শর্ত; এটাকে কেউ পাল্টে দিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মানেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। তাই তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের পরিচালনায় অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর হলেও প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে।

এই উপলব্ধি থেকেই সোমালিয়া (রেভল্যুশনারী সোসালিস্ট পার্টি, ১৯৭৬ সনে), কঙ্গো (পার্টি অব লেবার, ১৯৭০ সনে), বেনিন (পপুলার রেভল্যুশনারী পার্টি, ১৯৭৬ সনে) প্রভৃতি দেশে মধ্যস্তর থেকে আগত রাষ্ট্রীয় নেতারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একক অগ্রণী রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছেন। দক্ষিন ইয়েমেনের ঐক্যফ্রন্টের তিনটি প্রধান শরীক দল সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি দল গড়ে তুলছে। অতি সাম্প্রতিককালে ইথিওপিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে অগ্রণী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এ্যাঙ্গোলায় এ বছরের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে এম,পি,এল,এ-কে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একক পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আলজিরিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের নতুন জাতীয় কর্মসূচী, গিনির ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও তানজানিয়ার নবগঠিত রেভল্যুশনারী পার্টির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীতে রয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের গভীর প্রভাব। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে মোজাম্বিকের মুক্তি ফ্রন্ট ফ্রেলিমোকে অগ্রণী দল হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতিকার্য চলেছে।

অপুঁজিবাদী পথের কয়েকটি অভিজ্ঞতা

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলো ইতিমধ্যে বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তবে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কোন অভিজ্ঞতাই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা যায় না। এসব দেশের অনেকগুলোতেই বিজয়সমূহ নস্যাৎ করার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে চলে। অপুঁজিবাদী পথে অগ্রসর হয়ে স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার প্রচণ্ড বিরোধিতা আসে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে কমরেড ল, ই, ব্রেজনেভের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "মিথ্যা অপবাদ, জনগণকে প্রতারণা এবং অর্থনৈতিক অবরোধ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও খাদ্যাভাব সৃষ্টি করা এবং ঘুষ, হুমকি, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা ও ফ্যাসীবাদী কায়দায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা—এসবই এখন প্রতিবিপ্লব সংঘঠনের অস্ত্র ; আর এসব কার্যকরী হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যোগসাজশে।" এই সব বাধা, চক্রান্ত ও প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রযন্ত্রকে নতুনভাবে গড়ে তোলা ও শ্রমজীবী জনগণসহ জনগণের বৃহত্তর অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা, নতুন প্রশাসন-যন্ত্র সৃষ্টি ও জনগণের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া তথা বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

বিপ্লবী গণতন্ত্র

অ-পুঁজিবাদী পথে অগ্রসরমান দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে জনগণের প্রকৃত কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে প্রকৃত ও পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপুঁজিবাদী পথের দেশগুলোতে 'ফ্রি-স্টাইল' বুর্জোয়া গণতন্ত্র অকার্যকর ও অগ্রহণ-যোগ্যে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, এই ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও তাদের শোষণ বজায় রাখার জন্যই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সৃষ্টি।

তাই অপুঁজিবাদী পথে অগ্রসরমান দেশগুলো প্রচলিত চিন্তাধারাকে ছাড়িয়ে এক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে—যাতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যস্তরসহ ব্যাপক জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। আলজিরিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, কঙ্গো, গিনি, দক্ষিণ ইয়েমেন, তাঞ্জানিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে বিপ্লবী গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে। এ সব দেশের কোনটিতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বা ফ্রন্টে সমাজের সকল স্তরের জনগণ জমায়েত হচ্ছে, কোথাও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলসহ বিভিন্ন দলের একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠিত হচ্ছে। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা হলো যে, সমাজের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লড়াইয়ে প্রগতিকামী সকল শ্রেণী, দল ও গোষ্ঠিকে ঐক্যবদ্ধভাবে জমায়েত করা।

এই ধরণের বিপ্লবী গণতন্ত্রকে তাই বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দেশীয় ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি প্রচারকেরা অগণতান্ত্রিক এমনকি দল বিশেষ, ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষের একনায়কত্ব বলে প্রচার করে ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই গণবিরোধীদের 'অবাধ গণতন্ত্রের' মুখরোচক দাবী

উত্থাপনের আসল উদ্দেশ্য হলো প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের পক্ষে অবাধ প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা যেনো বিকশিত না হয় সেজন্য যা খুশী তাই লেখা ও বলা। এই সব গণবিরোধীদের ক্ষতিকর ও চক্রান্তমূলক কার্যপরিচালনার অবাধ স্বাধীনতাকে খর্ব করাও হলো বিপ্লবী গণতন্ত্রের এক দিক—আর সেই সঙ্গে ব্যাপক জনগণের প্রকৃত অধিকার কায়েম করা হলো আরেক দিক। বিপ্লবী গণতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করে এবং তাদের বিকাশের দ্বার পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে। অগ্রগতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অ-পুঁজিবাদী বিকাশ থেকে যেমন সমাজতন্ত্রের স্তরে অগ্রসর হওয়া যায়, তেমনি বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে উত্তরণ করা যায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে।

নতুন প্রশাসন-যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

অধনবাদী পথের দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, উপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবাপন্ন লোকের সমাবেশ থাকে। এই ব্যক্তিরাই প্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বাধা। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য নয়, বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা প্রথমাবস্থায় মোটামুটি পুঁজিবাদ-বিরোধী কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হলেও তাদের কঠিন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে দেয়া, প্রগতি-বিরোধীদের বিতাড়ন করে নতুন প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সাথে সাথে শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের উপর নির্ভর করে দেশের প্রগতির ভবিষ্যৎ।

এ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ রেখেই সদ্য-স্বাধীন প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সমাজ-প্রগতির সহায়তা প্রদানে সক্ষম নতুন দক্ষ, সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রশাসন-যন্ত্রের জন্য নতুন চেতনা ও দীক্ষায় শিক্ষিত

ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলতে হয়। এই নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রযন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাবে, জনগণ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করবে এবং রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডে মেহনতী মানুষের অংশ গ্রহণকে সুনিশ্চিত করে তুলবে। পুরাতন অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে সে স্থলে সামাজিক সম্পর্কের এক নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। নতুন প্রশাসন ব্যতীত এই প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করা যায় না। এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জনগণকে জমায়েত করে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়।

এক নতুন দেশপ্রেমিক প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলার কাজে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই অ-পুঁজিবাদী পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েও ঘানা, মালির প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব হয়।

বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের ঐক্য

আগেই বলেছি সোমালিয়া, কঙ্গো, বেনিন, দক্ষিন ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিপ্লবী গণতন্ত্রীরাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। আর অন্য কয়েকটি দেশও এই পথ ও লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। এসব দেশে শিল্প বিকাশের স্বল্পতার কারণে শ্রমিক শ্রেণী সে ভাবে গড়ে ওঠে নি এবং শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পৃথক কোন রাজনৈতিক দলও নেই। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থা।

কিন্তু ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি কতক দেশে—যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টি হিসেবে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে—সেখানে অবস্থা কিছুটা ভিন্নতর। এ সব দেশে মধ্যস্তর থেকে আগত বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। এ সব দেশে বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ঐক্যফ্রণ্ট দেশকে প্রগতির ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে

অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর করে নিচ্ছে। তবে, এসব দেশেও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের একাংশ ক্রমেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে মার্কসবাদী আদর্শ গ্রহণ করতেও শুরু করেছেন।

আবার আলজিরিয়া, গিনি, তানজানিয়া প্রভৃতি কতক দেশে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সরাসরি মার্কসবাদী আদর্শ গ্রহণ না করলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রভাবান্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছেন। ফলে, আলজিরিয়াতেও বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ঐক্য ও সমঝোতার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

আরও অনেক দেশ আছে যেখানে জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করার প্রশ্নে সাধারণ দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্গেও কমিউনিস্টদের ঐক্য ও সমঝোতার প্রশ্ন গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ও হচ্ছে। কেননা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করতে না পারলে সমাজ-প্রগতির ধারা সূচনা ও অগ্রসর করার প্রশ্ন বিবেচনা করা যায় না।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, স্বাধীনতা সংহতকরণ, এমনকি সমাজবিকাশের ক্ষেত্রেও সামরিক বাহিনী কতক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে—বাস্তব ঘটনা হিসেবে তা সকলেই প্রত্যক্ষ করছেন।

সামরিক বাহিনীর ভূমিকা

এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোর সেনাবাহিনী সমাজ-বিকাশের লড়াইয়ে নিরপেক্ষ থাকে বলে গণ্য করলে ভুল হবে। অপুঁজিবাদী পথে অগ্রসরমান দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনী একটি (কখনো একমাত্র) সংগঠিত ও কার্যকর শক্তি।

এমন নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটছে যেগুলোতে সশস্ত্র বাহিনী সমাজবিকাশের নেতৃত্ব প্রদানকারী ভূমিকা পালন ও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করছে এবং সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আলজিরিয়া, সোমালিয়া, কঙ্গো, সিরিয়া, ইরাক, বেনিন, বার্মা, ইথিওপিয়া ও অন্যান্য দেশের বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা যায়

যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি ও সমাজ-প্রগতির লড়াইয়ে সামরিক বাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব দেশে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত কয়েকজন প্রগতিশীল সামরিক অফিসার হলেন ঃ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সিয়াদ বারী (সোমালিয়া), মেজর মিরিয়াম নুগাবি (কঙ্গো), কর্ণেল হুয়ারি বুমেদীন (আলজিরিয়া), জেনারেল নে উইন (বার্মা), মেজর মেন্‌গিস্টু হাইলে মিরিয়াম(ইথিওপিয়া), লেঃ মেথিউ কেরেকু (বেনিন), ক্যাপ্টেন দিদিয়ের রাতসিরাক (মালাগাছি) প্রমুখ। আর কর্নেল জামাল আবদুল নাসের-এর নেতৃত্বে মিশর বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথে অগ্রসর হয়েছিল। আফগানিস্তান, নাইজিরিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি রাষ্ট্রেও সামরিক বাহিনী প্রগতিশীল বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

আবার কতক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। চিলিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা যে ফ্যাসিস্ট পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে এবং ন্যক্কারজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে—তা সকলেই জানেন। চিলির সামরিক জান্তার পক্ষে প্রকাশ্যে উকালতি করা আজকাল মার্কিন সরকারের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। অতীতে ইন্দোনেশিয়ায় কি ঘটেছিল তাও সকলে জানেন। সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডে প্রতিক্রিয়ার পক্ষেই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। এসব দেশে সামরিক বাহিনী পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ এবং ১৯৭৫ সনের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ৯০টির বেশী সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে বা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। এখন আফ্রিকার ৪৭টি দেশের মধ্যে ২০টি দেশে সামরিক সরকার রয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজ প্রগতির লড়াইয়ে সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করেন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে, বিশেষতঃ যে সব দেশে সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠেনি, অথবা কোন না কোন কারণে রাজনৈতিক শক্তির অবস্থান দুর্বল রয়ে গেছে—এমন দেশগুলোতে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কতক দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তিকে অপসারিত করেও সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করছে। সামরিক বাহিনী সমাজ-প্রগতির পক্ষে অবস্থান নিলে প্রগতির ধারা অগ্রসরও হচ্ছে। আবার, তারা প্রতিক্রিয়ার পক্ষে দাঁড়ালে স্বভাবতই পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

যে সব দেশে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র-ক্ষমতায় থেকে প্রগতির ধারাকে অগ্রসর করে নিচ্ছে; ঐ সব দেশে কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি থাকলে—এই দুই শক্তির সম্পর্ক ও সমঝোতার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-প্রগতির লড়াই আসলে তৃতীয় বিশ্বের মূল রাজনৈতিক লড়াই। কাজেই এ সব দেশে সামরিক বাহিনী কার্যতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই, এসব দেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি(যদি থাকে) এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে অহেতুক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব মূলতঃ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়ার জন্যই সুযোগ সৃষ্টি করে। এসব কারণে তৃতীয় বিশ্বে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়গুলি আজকাল প্রগতিশীল রাজনৈতিক তাত্বিকরা গভীরতার সঙ্গেই বিবেচনায় আনছেন। এ সব বিষয়ে আজকাল তাই প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা ইত্যাদিও প্রকাশিত হচ্ছে।

সমাজতন্ত্র ও বাংলাদেশ

এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় এটা আজকে সুপ্রমাণিত যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে স্বাধীন-আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলাই পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্তির পথ। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের

নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েই জনজীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সুখী-সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। দেশের শোষিত নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যস্তরের জনগণের প্রকৃত মুক্তি আজ আর কোন কল্পনা-বিলাস নয়।

বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অপঁুজিবাদী বিকাশের পথে আত্মতির্ভরশীলতা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমান যুগটাই হলো জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির যুগ। তবে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই আমাদের দেশে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ খুব জটিল ও কঠিন কাজ। একে সরলীকরণ করে দেখা যায় না। এসব কথা মনে রেখেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত রেখে "সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে ধনবাদ পরিহার করিয়া স্বাধীন স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য" সমস্ত দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশর কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, সকল দেশপ্রেমিক দল ও শক্তির সমবেত কর্ম প্রচেষ্টা এবং দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত উদ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সুখী-সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা, স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পেঁৗছে দেওয়া এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে এক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের সংগ্রামই আমাদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজিকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনে রেখেই আমাদের জনগণ বিশেষত: প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশ ও নতুন ইতিহাস বিচার

আবদুল হালিম

পাঁচ বছরের বেশী হয়ে গেল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। পাঁচ বছর আগে নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। দায়িত্ব পড়েছিল দেশ গড়ার, দায়িত্ব পড়েছিল মানুষ গড়ার। এ সকল কাজ সমাধা হয় নি অবশ্য, এত দ্রুত সমাধা হওয়াও সম্ভব নয় ; তবে অনেক সৃষ্টিধর্মী কথা ও কাজের সূত্রপাত ঘটেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন, কারিগরি বিকাশ সাধন, মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির জন্য প্রচেষ্টা ও তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয়ে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেয়া হয়নি, তা হল স্বদেশ ও সংস্কৃতির সঠিক ইতিহাস রচনা। এ কাজ অবশ্য অত্যন্ত কঠিন, কারণ আমাদের দেশে ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব রয়েছে এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করলে আমরা আমাদের সাম্প্রতিক ও দূর অতীতের ইতিহাস বিশ্লেষণ বা অনুধাবন করতে পারব না।

নতুন ইতিহাস বিচার কেন ?

অচল পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি যে একটা কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে তা হল, আমাদের এ যাবতকালের ইতিহাস বিচারে মস্ত একটা গলদ ছিল। যতদিন পাকিস্তানের গণ্ডীর মধ্যে ছিলাম ততদিন এ ভ্রান্তি অনুধাবন করা কঠিন ছিল সে কথা সত্যি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যখন আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করে ঠিক করতে পারি কি কারণে, কোন কোন ঐতিহাসিক শক্তির ক্রিয়ার দরুন আমরা পাকিস্তান বানিয়েছিলাম, এবং পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা মুক্তি লাভ করেছি এবং কোন লক্ষ্য অভিমুখে আমাদের জাতীয় বিকাশ সম্ভবপর। পাকিস্তানী আমলে আমাদের ইতিহাসবোধ গড়ে উঠেছিল অন্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং ধর্মবিদ্বেষকে কেন্দ্র করে। এ দৃষ্টিভঙ্গী যে নিতান্ত অনৈতিহাসিক তা আজ আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, আমাদের জাতীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারা উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস নতুন দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে, তাতে কোন কোন ঐতিহাসিক উপাদান যুক্ত হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে। সোজা কথায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে ১৯৪৭ থেকে নয়, ১৭৫৭ সাল থেকে, এবং বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নির্ধারক উপাদান খুঁজতে হবে এদেশেরই অতীতে এবং বর্তমান বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে।

এ প্রসঙ্গেই দেখা দেয় জটিলতা। আমাদের অতীত ইতিহাস বিচারে পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকে এক মত হলেও, কোন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা কর্তব্য সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ইতিহাসবিদগণ ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন ধনতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে তো বটেই, পাকিস্তানী আমলেও আমাদের দেশের

উপর পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সাংস্কৃতিক আধিপত্য পুরোমাত্রায় সক্রিয় ছিল। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানী আমলে ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিপুলভাবে প্রভাবিত। আমাদের দেশের ইতিহাসবিদগণ একটা উৎস থেকেই ইতিহাস জ্ঞান এবং ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, সেটা পাশ্চাত্য বুর্জোয়া ইতিহাস। আমাদের দেশের যাঁরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ান তাঁরা জানেন না বা মানেন না যে, শতাধিক বছর আগে ইতিহাস চর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে—এ পদ্ধতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা সাধারণভাবে মার্ক্সবাদী পদ্ধতি নামে পরিচিত। আমাদের ইতিহাসবিদগণ মার্ক্সবাদ জানেন না বলতে আমি একথাই বোঝাচ্ছি যে, তাঁরা মূল উৎস থেকে কখনও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আয়ত্ত করেননি বা আমাদের দেশের ইতিহাস বিচারে তা কখনও সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেননি, বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মুখে মার্ক্সবাদের সমালোচনা শুনেই সন্তুষ্ট থেকেছেন এবং তাকে বর্জন করেছেন।

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রালগ্নে আজ আমাদের ভেবে স্থির করা দরকার বুর্জোয়া ইতিহাস আমাদের কি দিতে পারে, আমাদের আত্মোপলব্ধিতে, আমাদের জাতীয় বিকাশে কতখানি সাহায্য করতে পারে।

বুর্জোয়া ইতিহাসের দোষ কোথায়?

বুর্জোয়া ইতিহাসের প্রধান ত্রুটি হল এটা ইতিহাস যে একটি বিজ্ঞান সেকথাই পুরোপুরি অস্বীকার করে অথবা ইতিহাসের গতিধারার কারণ নির্দেশে ব্যর্থ হয়। একথা প্রতিপন্ন করার জন্য বেশী বাক্যব্যয় না করে বুর্জোয়াদের প্রিয় অসওয়াল্ড স্পেংলার-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। স্পেংলার বলেছেন, "বিশ্ব ইতিহাসের বৈচিত্র্যহীন সরলরৈখিক অগ্রগতির পরিবর্তে আমি দেখি উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির উত্থান-পতন। এর প্রত্যেকটির নিজস্ব ভাব, নিজস্ব আবেগ আছে, আছে নিজস্ব জীবন, বাসনা, অনুভূতি এবং মৃত্যু। একগুঁয়ে ঐতিহাসিকরাই কেবল ইতিহাসকে

মনে করে একজাতের ফিতা ক্রিমির (tape worm) মত যাতে পর্যায়ের পর পর্যায় সংযুক্ত হয়ে চলেছে" (Spengler রচিত Decline of the West দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক, দশখণ্ডে রচিত Study of History প্রণেতা আর্নল্ড টয়েনবিও স্পেংলারের মত মনে করেন যে, বিভিন্ন সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করে, একে অন্যকে সমৃদ্ধ করেনা, বা এক সভ্যতা অন্য বা পূর্ববর্তী সভ্যতার উপর নির্ভরশীল না। টয়েনবি ঐতিহাসিক প্রগতিতে বিশ্বাস করেন না, তিনি ইতিহাসের চক্রগতিতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, বিশ্ব ইতিহাস কতকগুলো সভ্যতার সমষ্টি যেগুলো জন্ম, বিকাশ, পতন এবং ধ্বংস এ কয়টি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গমন করে। মানব সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞানও আছে তার পক্ষে এ সকল অর্থহীন প্রলাপে মুগ্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

ইতিহাস সম্পর্কে বুর্জোয়া পণ্ডিতদের কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলেও তারা অবশ্য চুপ করে বসে নেই। নিত্য নতুন ইতিহাসের দর্শন উপস্থিত করে তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মেরামতির কাজ চালিয়েই যাচ্ছেন। সত্য বটে, পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে তাদের এ দর্শন ছিল আশাবাদী, এবং পুঁজিবাদের পতনের যুগে আজ সে দর্শন সাধারণভাবে নৈরাশ্যবাদী রূপ ধারন করেছে। কিন্তু আগাগোড়াই বুর্জোয়া ইতিহাস একনিষ্ঠভাবে একটা কাজ করে গেছে, তা হল পুঁজিবাদী স্বার্থে মানুষের ইতিহাসকে বিকৃত করা। অবশ্য ধনিক শ্রেণীর পক্ষে তাদের ঐতিহাসিক অবস্থানের দরুনই ইতিহাসকে বিকৃত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

সত্যকে অবিকৃত রেখে পুঁজিবাদীরা কিভাবে তাদের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দিতে পারে? সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেখানকার আদিবাসীদের প্রায় নির্মূল করে সমগ্র ভূভাগ দখল করা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসীদের বিনাশ করা, পুরো আফ্রিকাকে পদানত করে তার সমগ্র জনগণকে ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে অনুন্নত রাখা, এশিয়ার ব্যাপক অংশকে উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশে পরিণত করা—

এসবের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে গেলে ইউরো-মার্কিন পুঁজিবাদীদের ইতিহাস বিকৃত না করে কি উপায় আছে? আরও সাম্প্রতিককালে,১৮৯৮ সালে ফিলিপাইনে মার্কিন আগ্রাসন, ১৯১৯—২২ সালে তুরস্কের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন, ১৯১৯ সালে কোরিয়ার অভুত্থান জাপ সাম্রজাবাদীদের বর্বর আক্রমণ, ১৯২৬—২৭ সালে জাভা ও সুমাত্রার গণঅভ্যুত্থান দমন, মরক্কোতে ১৯২৫ সালে ফরাসী ও স্পেনীয় উশনিবেশবাদীদের আগ্রাসন, একই ফরাসী কর্তৃক সিরিয়ার গণঅভ্যুত্থান দমন এবং দামাস্কাসে বোমা বর্ষণ করে ২৫ হাজার মানুষ হত্যা, ভারতবর্ষ ও বর্মায় ১৯৩০—৩২ সাল এবং অন্যান্য সময়ে অজস্র শাস্তিমূলক অভিযান, চীনের বিরুদ্ধে ১৯৩১ সাল থেকে জাপানের আগ্রাসন—এ সকল ঘটনাকে সত্যের আলোকে বিচার করলে সাম্রাজ্যবাদীদের খুবই অসুবিধা। তাই স্বভাবতঃ বুর্জোয়া ইতিহাসকে বুর্জোয়া স্বার্থের অনুসারী হতে গিয়ে সত্য ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটাতে হয়েছে। এখন যখন অধিকাংশ উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে তখন তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে স্ববশে রাখার জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে নানা রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হচ্ছে; অবৈজ্ঞানিক বুর্জোয়া ইতিহাস এবং বিকৃত ইতিহাস সে ব্যাপক প্রয়াসেরই অঙ্গ।

বুর্জোয়া ইতিহাস পড়ে আমরা কি শিখি তা বিচার করলেই এর অসারতা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বুর্জোয়া ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, আফ্রিকা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ, এবং ইউরোপীয়রা সেখানে গিয়েছিল নিঃস্বার্থভাবে সভ্যতার বিস্তার করতে। আফ্রিকার অনেক অঞ্চল যে মধ্যযুগে উন্নত ফিউডাল পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো আফ্রিকার কোটি কোটি জনগণকে বন্দী করে আমেরিকায় দাস হিসেবে চালান দিয়ে আফ্রিকার জনসম্পদ হরণ এবং অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠন করার ফলেই যে পঞ্চদশ শতকের পর থেকে আফ্রিকার সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল সে কথা আমরা বুর্জোয়া ইতিহাস পড়ে কোনদিন জানতে পারবনা। বুর্জোয়া ইতিহাস পড়ে আমরা আরো জানতে পারব, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন

বাঙালী ও ভারতবাসীদের উন্নতি সাধনের জন্য বৃটিশ উপনিবেশকরা কেমনভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা এদেশে কায়েম করেছিল, কিন্তু সে ইতিহাস আমাদের কোন দিন বলে দেবেনা বৃটিশরা কেমনভাবে আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পের স্বাধীন বিকাশকে ব্যাহত করেছিল।

বস্তুতঃ সাম্রাজ্যাবাদ উপনিবেশবাদের শিকার তৃতীয় বিশ্বের জনগণের পক্ষে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে বুর্জোয়া ইতিহাস আসলে ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র। কিন্তু বুর্জোয়া ইতিহাস বিদ্যা যে মূলগতভাবে অবৈজ্ঞানিক সেটা বোঝার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়, তার জন্য ইতিহাস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও আয়ত্ত করা দরকার। মার্ক্সবাদী ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় বুর্জোয়া ইতিহাসের গলদ কোথায় এবং ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা কোন মুখী।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি বলে

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্ক্সবাদী ইতিহাস বিচার সমাজ বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করে ইতিহাস শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানব ইতিহাসের বিকাশের ধারা সম্পর্কে যা বলে তা নিম্নরূপঃ

(১) আদিমকাল থেকে মানবসভ্যতাকে পর্যায়ক্রমে একাধিক সমাজব্যবস্থার মধ্যদিয়ে পার হতে হয়েছে। প্রথমে ছিল শ্রেণীহীন গোষ্ঠী সমাজ ও গ্রাম্য সমাজ, তারপর উদিত হয় দাসশ্রমভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, দাস সমাজের বিলোপের মধ্যদিয়ে আসে ফিউডাল বা সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজকে ধ্বংস করে আবির্ভূত হয় ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ, ধণতান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করে উদিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। উপরোক্ত সমাজ ব্যবস্থাগুলো হলো মানব সমাজের ক্রমিক প্রগতিশীল ধাপ।

(২) উপরোক্ত সমাজব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠে নিদিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে। উৎপাদন ব্যবস্থা নিরূপিত হয় উৎপাদন শক্তি ও

উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা। উৎপাদন সম্পর্ক বলতে বোঝায় উৎপাদন যন্ত্রকে কেন্দ্র করে উৎপাদনরত মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে। শ্রেণীহীন সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক হয় সমতাভিত্তিক—প্রত্যেকেই উৎপাদনযন্ত্রের সমান অধিকার সম্পন্ন মালিক। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক হয় শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক—উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা হয় শোষকশ্রেণী, যাদের শ্রমে উৎপাদন হয় তারা হয় শোষিত শ্রেণী। যেমন দাসমালিক, জমিদার বা সামন্তপ্রভু এবং পুঁজিপতি—এরা হল শোষকশ্রেণী, আর দাস, সামন্তকৃষক, শ্রমিক—এরা হল শোষিত শ্রেণী।

(৩) উৎপাদন ব্যবস্থা হল সমাজের বস্তুগত ভিত্তি। এর উপর গড়ে উঠে সমাজের বিভিন্ন ভাবধারা (যথা, দার্শনিক, ধর্মীয়, নৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ইত্যাদি চিন্তাধারা) এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংঠন (যথা, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি)। আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, একজন মানুষ তার খেয়াল খুশী মত চিন্তাভাবনা করতে পারে, কিন্তু আসলে এক একটা সমাজ ব্যবস্থায় এক একটা ভাবাদর্শের উদয় হয়। যেমন সব সামন্তসমাজে একই ধরনের চিন্তা লক্ষ্য করা যায়, যেমন চিন্তার মিল দেখতে পাওয়া যায় সব পুঁজিবাদী সমাজে। গণতন্ত্রের ধারনা মধ্যযুগে সামন্তসমাজে ছিলনা, আবার জমিতে বেগার খাটানো বা কারখানায় মজুর খাটিয়ে মুনাফা অর্জনের ধারনা আদিম শ্রেণীহীন সমাজে ছিলনা।

(৪) সমাজের পরিবর্তন ঘটে উৎপাদন শক্তির বিকাশের ফলে। উৎপাদন শক্তির বিকাশের এক পর্যায়ে উৎপাদন সম্পর্ক যখন উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা আরোপ করে তখন পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক ধ্বংস করে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক তথা নতুন সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করে। যেমন, সামন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জন্ম নিয়েছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক তথা পুঁজিবাদী সমাজ।

(৫) শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর শ্রেণী-সংগ্রাম সমাজ বিকাশের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে। যেমন, বর্তমান-

কালে শ্রমিক শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সংগ্রাম সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

(৬) জনগণই ইতিহাসের মূল নির্মাতা। মানব সভ্যতা ও মানব ইতিহাস নির্মাণ করেছে শ্রমজীবী জনগণ। জনগণের যুগযুগব্যাপী পরিশ্রমে সৃষ্ট বস্তুগত উপকরণ সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করেছে। জনগণের পরিশ্রমেই প্রত্যেকটা সমাজব্যবস্থার বস্তুগত ভিত্তি এবং সে সূত্রে সমগ্র সমাজ কাঠামো গঠিত হয়েছে। মানুষের ইতিহাস হল শ্রমজীবী জনগণের শ্রমের ইতিহাস।

(৭) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সভ্যতার ইতিহাসে ব্যক্তির অবদান বা জননায়ক ও প্রতিভাবান ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করেনা। বস্তুত, ঐতিহাসিক বা সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য যুগে যুগে জননায়ক বা প্রতিভাবান ব্যক্তির উদয় ঘটে থাকে, যার মধ্য দিয়ে আসলে একটা যুগের বা একটা জাতির বা একটা শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খাই প্রকাশ লাভ করে।

(৮) উপরে যে কয়েকটি সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হল সমস্ত দেশকে যে তার সবক'টির মধ্য দিয়ে পার হতে হবে এমন কোন কথা নেই। মানব সমাজকে অবশ্যই ঐ ক'টি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, কিন্তু ঐ যাত্রাপথে অনেক জাতি বা গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি হয়তো অর্ধেক পথে থেমে রয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্পষ্টতই, পৃথিবী সমাজতন্ত্রের স্তরে এগিয়ে যাওয়ার পরও অধিকাংশ দেশই এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ বা প্রাক-সামন্ত যুগে পড়ে আছে। এমন যখন হয়, তখন অনুন্নত সমাজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় তার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক এবং উন্নততর সমাজের সাথে তার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সূত্রসমূহ আমাদের দেশে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় এখনও সামন্ত উপাদানই সমধিক। আমাদের দেশের বিকাশ তাই উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার দ্বারাই প্রভাবিত হবে। পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে উন্নততর সমাজব্যবস্থা আছে

দু'টো—উন্নত ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। ধনতন্ত্র যদিও আমাদের সমাজের চেয়ে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল, বিশ্বপর্যায়ে বিচার করলে এটা অনুন্নত ও প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ তার চেয়ে উন্নততর সমাজব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের তাই জাতীয় বিকাশের জন্য পুঁজিবাদ এড়িয়ে অধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু তার জন্য যে বাস্তব ভিত্তি ও ভাবগত পরিমণ্ডল আবশ্যক তা আমাদের দেশে নেই। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আমাদের বলে দেয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উৎপাদন সম্পর্ককে ভিত্তি করে সমাজের ভাবাদর্শ, চিন্তাধারা ইত্যাদি গড়ে ওঠে। স্পষ্টতই, আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এসেছে বাইরের প্রভাবের ফলে। আবার বাইরের প্রভাবরূপে ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া ভাবধারাও আমাদের দেশে এসেছে এবং এটাই সমধিক শক্তিশালী, কারণ আমরা দীর্ঘকাল ধরে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার গণ্ডীর ভিতর বাস করছি। আমাদের জাতীয় বিকাশের স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ভাবধারা ও অর্থনীতিকে পরিহার করে উন্নততর প্রগতিশীল ভাবধারা সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সমাজ বিকাশের নিয়মগুলোকে স্পষ্টভাবে জানতে বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা পারব পরিকল্পনামাফিক সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে যেমনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ তাদের সমাজকে ক্রমিক প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমাদের জাতীয় বিকাশের পথ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে তাই আমাদের দেশের বিদ্বানমণ্ডলী ও ইতিহাসবিদদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকা তাঁরা পালন করতে পারেন কেবল ইতিহাস বিচারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আয়ত্ত করার মাধ্যমেই।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বনাম বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্যা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে আমরা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে দাবী করেছি। কিন্তু এ কথায় অনেকেই হয়তো আপত্তি তুলবেন। পৃথিবীর সব দেশের বুর্জোয়া পণ্ডিতরা অবশ্য এতে আপত্তি তুলে থাকেন

তাঁদের শ্রেণী অবস্থানের দরুন। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া ইতিহাসে আস্থাবান রয়েছেন শ্রেণীস্বার্থবোধের তাড়নায় নয়, হয়তো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবে পড়ে। তাই, বুর্জোয়া ইতিহাস যে ভ্রান্ত এবং মার্ক্সবাদী ইতিহাস বিচার যে বিজ্ঞানসম্মত এ কথা প্রতিপন্ন করলে তা ফলপ্রসু হতে পারে।

কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব সত্য কি মিথ্যা তার একমাত্র নিরিখ হল বাস্তব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবল মানুষের অতীত ইতিহাসই বিশ্লেষণ করেনি, তা বর্তমান ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সমকালীন ইতিহাসের বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয়ে যায় মার্ক্সবাদ কত অভ্রান্ত।

পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা বরাবর ঘোষণা করে এসেছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী। এক শ' বছরের বেশী আগে মার্ক্সবাদের যুগ্ম আবিষ্কর্তা কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে ঘোষণা করেছিলেন যে, সামন্ত সমাজের ধ্বংসের মাধ্যমে যেমন মধ্যযুগের অবসানে পুঁজিবাদী সমাজের উদয় হয়েছিল তেমনি আভ্যন্তরীণ অসংগতির দরুণ, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজ ধ্বংস হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ উদিত হবে। এ সমাজের রূপরেখাও অঙ্কন করেছিলেন মার্ক্স-এঙ্গেলস। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের যে বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা হল ঃ উৎপাদন যন্ত্র হিসেবে জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার বিলোপ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতে গঠিত একচেটিয়া ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাতীয় ব্যাঙ্কে সমস্ত ক্রেডিট ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ, সমস্ত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কল-কারখানা ও উৎপাদনযন্ত্রের প্রসার, বিদ্যালয়ে সকল ছেলেমেয়ের অবৈতনিক শিক্ষাদান, সকলের পক্ষে সমান বাধ্যতামূলক শ্রম ইত্যাদি। আমরা জানি উক্ত ঘোষণার মাত্র ৭০ বছরের মধ্যে মার্ক্স-এঙ্গেল্স্-এর সুযোগ্য শিষ্য মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে সাবেক জার-শাসিত রাশিয়া রূপান্তরিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে, যার সামাজিক অর্থনৈতিক

সংগঠন কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে ঘোষিত সমাজব্যবস্থার হুবহু অনুরূপ। বুর্জোয়া ইতিহাসশাস্ত্র শুধু যে এরকম সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে অপারগ তাই নয়, পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদিত হওয়ার বহু বছর পরেও বুর্জোয়া পণ্ডিতরা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অক্ষমতা প্রদর্শন করছেন। তাঁরা এখনও মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করার অসম্ভব চেষ্টায় মেতে আছেন।

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্যার অসারতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল ১৯১৪ সালের প্রথম বিশযুদ্ধ। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের পরবর্তীকালের সাক্ষ্য অনুযায়ী, তাঁরা এর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না, এটা ছিল তাঁদের পক্ষে একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। টয়েনবির ভাষায়, "১৯১৪ সালের এক-আধ বছর আগে আমার বা আমার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মনে এখনকার তরুণদের মত কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। ১৯১৪ সালের অব্যবহিত পূর্বে ইংলণ্ডের লোকেরা নিশ্চিতভাবেই ধরে নিত যে তারা এক সভ্য জগতে বাস করছে, যে জগৎ যুক্তিপূর্ণ, মানবিক, শৃংখলাপূর্ণ।" শুধু টয়েনবি নয়, সারা পৃথিবীর বুর্জোয়া পণ্ডিতরা ১৯১৪ সালের আগের পৃথিবীকে একটা লুপ্ত সোনালী যুগ বলে চিত্রিত করেছেন আর ইতিহাসের গতিধারাকে অনুধাবন করতে না পেরে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের যুগ এ বিশ শতককে অভিহিত করেছেন 'ভয়ংকর বিংশ শতাব্দী' রূপে। অথচ, প্রথম বিশযুদ্ধের ২৫ বছর আগেই এঙ্গেলস পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের তাড়নায় সাম্রাজ্যবাদ অতিশীঘ্রই কিরকম ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হবে (কার্ল লিব্‌কনেখটের নিকট লিখিত পত্র ১৮৮৮)। পুরাতন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক এই শতকের শুরু থেকে একের পর এক প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে চলেছে তার সম্পর্কে হুশিয়ারি প্রদান করে। কিন্তু বুর্জোয়া ইতিহাস প্রকৃতিগতভাবেই এ সকল কথা অনুধাবন করতে অপারগ, কারণ সত্যানুসন্ধান নয়, বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষণই তার লক্ষ্য। আর বর্তমান

যুগে যেহেতু বুর্জোয়া স্বার্থ ইতিহাসের গতির পরিপন্থী, বুর্জোয়া ইতিহাসশাস্ত্র তাই সত্য বিবর্জিত হতে বাধ্য।

বুর্জোয়া ইতিহাসের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে নেই বলে সংক্ষেপে দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। উৎসাহী পাঠক রজনী পাম দত্ত প্রণীত 'Problems of Contemporary History' পাঠ করলে বিস্তৃত আলোচনার সাক্ষাৎ লাভ করবেন।

বাংলাদেশে মার্ক্সবাদ চর্চার অভাব

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বাইরে অবশিষ্ট দুনিয়ার সব দেশেই বুর্জোয়া ভাবাপন্ন ইতিহাসবিদরাই আসর দখল করে আছেন। তবে অনেক দেশেই তার পাশাপাশি মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও নিজেদের মত কাজ করে চলেছেন। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার ধারা এঁরাই বজায় রাখছেন।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের সকল অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে বৃটিশ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্তের 'India Today' কিংবা 'Crisis of Britain and the British Empire' গ্রন্থ। মার্কিন নিগ্রো দাসদের ইতিহাস সম্পর্কে মার্কিন বুর্জোয়া পণ্ডিতদের সহস্র অপপ্রচারকে অসার প্রতিপন্ন করেছে মার্কিন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক হার্বার্ট আপথেকার-এর মৌলিক গবেষণাগ্রন্থসমূহ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬০-৬৪) সম্পর্কে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা হাজার হাজার বিপুলায়তন গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে আপথেকার রচিত অনধিক ২০ পৃষ্ঠার বইটির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে যে সব কাহিনী প্রচারিত হচ্ছিল তার সব জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত একাধিক বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ('British Foreign Policy During World War II', Diplomacy of Aggression', 'Anti-Hitler Coalition', 'Finale' ইত্যাদি)। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ কেবল তাঁদের

দেশ কালের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি, সারা দুনিয়ার বিশেষতঃ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর অতীত ও সমকালীন ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। 'Africa in Soviet Studies', 'Asia in Soviet Studies', '50 Years of Soviet Oriental Studies' প্রভৃতি গ্রন্থ ও পুস্তিকানিচয়ে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

শুধু সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী পদ্ধতি কৃতিত্ব দেখায়নি। মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', গর্ডন চাইল্ড-এর 'Man Makes Himself', 'Dawn of European Civilization' প্রভৃতি, বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের 'Greek Science in Antiquity' ইত্যাদি গ্রন্থ লিখিত না হলে আজ পর্যন্ত মানবসমাজের প্রাচীন ও প্রাগিতিহাসের স্থানে যে কতকগুলো বুর্জোয়া কল্পকাহিনীমাত্র বিরাজ করত তাতে সন্দেহ নেই। দেশে দেশে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের এ সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চা মানবসমাজের অক্ষয় সম্পদরূপে বিরাজ করবে।

অথচ আমাদের দেশের বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে মার্কসবাদ প্রসার লাভ করেনি বলে আমাদের দেশের ইতিহাস চর্চা একটা শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গত ২৮ বছর ধরে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সূত্রে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার ধারা আমাদের দেশে বজায় রেখেছে। কিন্তু এটা নিতান্তই অপ্রতুল এবং একটা রাজনৈতিক দলের কাজও নয় সর্বাত্মক ইতিহাস চর্চা। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের নব মূল্যায়ন বা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এবং ভবিষৎ বিকাশের ধারা অনুধাবনের জন্য স্বদেশের এবং পৃথিবীর ইতিহাসকে তথা মানব ইতিহাসের ধারাকে আয়ত্ত করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্ক্সবাদী পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চা শুধু আমাদের সত্য দৃষ্টিই দান করবে না, স্বাধীন বাংলার অন্তহীন বিকাশেরও পথ দেখাবে।

রক্ত, মুনাফা ও বন্দী তৃতীয় বিশ্ব

মফিজুল হক

১. মুনাফা

> If money comes into the world with a congenital blood-stain on one cheek, capital comes dripping from head to foot, from every pore,. with blood & dirt.
>
> Karl Marx.

পশ্চিমী পুঁজিবাদী সমাজের জৌলুষ ও জ্বলজ্বলে সম্পদে সকলেরই, বিশেষতঃ যারা আমাদের মতো অনুন্নত দেশের বাসিন্দা, তাদের তাক লেগে যায়। যে বিশাল সম্পদ আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা' পশ্চাৎপদ দেশের দরিদ্র নাগরিককে স্বাভাবিকভাবেই মোহিত ও বিস্মিত করে। ধনগৌরবে পুঁজিবাদ চিরকালই অহংকারী এবং সতত সগৌরবে ঘোষণা করেছে উন্নতির পথ একটাই ও তা' পুঁজিবাদের সোপান বেয়ে।

পুঁজিবাদের মার্কিন-ইউরোপীয় বর্ণোজ্জ্বল দ্বীপসমূহ ঘিরে রয়েছে বিশাল দারিদ্র-সমুদ্র—তৃতীয় দুনিয়া। কখনো ঈর্ষা, কখনো ক্ষোভ, কখনো দুঃখ, কখনো ক্রোধ নিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার মানুষ তাকিয়েছে

পুঁজিবাদের দিকে। একই সময়কালে একই বিশ্বে দেশ থেকে দেশান্তরে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য, দৈন্য ও প্রাচুর্যের এমনি বৈষম্য বোধকরি ইতিহাসে আর কোনোকালে ছিল না।

এবং পুঁজিবাদের গুণমুগ্ধ ভক্তের অভাবও কোথায়ও কখনো হয়নি, কি পুঁজিবাদী দেশে, কি অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশে। পুঁজিবাদকে উন্নতির আদর্শ রূপে ঘোষণা করলেও এই গুণমুগ্ধ মহল একটি সাদা সত্য সবসময়েই ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছেন, তা' হচ্ছে চারিপাশের দরিদ্র ভুবনকে শোষণ করেই পুঁজিবাদী দ্বীপখণ্ডের সম্পদ-স্ফীতি।

সিয়ামীজ যমজের মতো কিংবা বলা চলে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত উন্নতি অবনতি। ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে উন্নত অংশের উন্নতি হচ্ছে অনুন্নত অংশের অনুন্নতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পর-নির্ভর ও ডায়ালেকটিক। ত্রিনিদাদ টোবাগোর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এরিক উইলিয়ম্‌স্ তার 'পুঁজিবাদ ও দাসত্ব' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের অর্থ এসেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো দাসত্বের মুনাফা থেকে। অপর ইতিহাসবিদ ব্রুক অ্যাডামস তার 'অবক্ষয়ী সভ্যতার সূত্রসমুহ' গ্রন্থে বলেছেন শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয় ঘটেছে ভারতবর্ষ লুঠ করে। এক্ষেত্রে উভয়েই সত্যি কথা বলেছেন। উপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও নির্মম শোষণ থেকেই পুঁজিবাদের যাত্রারম্ভ। তারপর থেকে দুনিয়ার সব নদীতেই বহু জল গড়িয়েছে, সমাজ ও ইতিহাস অনেক পথ এগিয়ে এসেছে কিন্তু চারপাশের জগতকে শুষে স্ফীত হয়ে ওঠার পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার মূল নকশাটি আজো অব্যাহত রয়েছে।

কয়েকটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক। অধুনা পুঁজিবাদের পতাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রইলেও আদিতে তার বাহক ছিল বৃটেন। বৃটিশ পুঁজিবাদের স্বর্ণসময় ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ অবধি বৃটেনের বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২'৪ বিলিয়ন পাউণ্ড। একই সময়ে এই বিনিয়োগ থেকে

বৃটেনের আয়ের পরিমাণ হচ্ছে ৪·১ বিলিয়ন পাউণ্ড। ডান হাতে সে অনুন্নত বিশ্বে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে এবং বাম হাতে মুনাফা তুলে এনেছে। ডান হাতে যা দিয়েছে তার চেয়ে ৭০ শতাংশ বেশী তুলেছে বাম হাতে। পুঁজিবাদের বর্তমান নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমনি পরিসংখ্যানে দেখা যায়। ১৯৫০–'৬৩ সময়কালে আমেরিকা থেকে বহির্গত পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে ১৭·৪ বিলিয়ন ডলার এবং আগত মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে ২৯·৪ বিলিয়ন ডলার। কাকতালীয় হলেও লক্ষ্যণীয় এক্ষেত্রেও মুনাফার হার ৭০ শতাংশ।

উপনিবেশিক শোষণ বোঝা কষ্টকর নয়, সেটা দৃশ্যগোচর ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব, যেখানে পরাধীন জনসমষ্টির সংখ্যা ১ শতাংশেরও কম, যখন তৃতীয় দুনিয়ার প্রায় সকল দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তখনও পুঁজিবাদী শোষণ কী ভাবে অব্যাহত রয়েছে সেটা বোঝা পূর্বের মতো সহজসাধ্য নয়। সাদা চোখে এই নয়া-উপনিবেশিক শোষণের জাল সহজে ধরা পড়ে না।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর নিজেদের পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অংশী হিসেবেই দেখতে পায়। দেশীয় পশ্চাৎপদ সামাজিক কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা তাকে পুঁজিবাদী ঘূর্ণাবর্তেই বেঁধে রাখে। ফলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নির্ভর করে অর্থনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার ওপর। পুঁজিবাদী বিশ্ব কাঠামোতে বাঁধা থাকলে অনুন্নত দেশের ক্রমাবনতির পথে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

পুঁজির শাসনে বন্দী তৃতীয় বিশ্ব আজো পশ্চিমী ধনিকদের অর্থসম্পদের প্রধান যোগানদার। অধুনা যে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বা মালটিন্যাশনাল করপোরেশন নিয়ে দুনিয়াজোড়া গুঞ্জন উঠেছে তাদের মুনাফার প্রধান উৎস পশ্চাৎপদ তৃতীয় বিশ্ব। এই মুনাফার হার বিস্ময়কর, প্রায় অবিশ্বাস্য। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৭০ সালে এশিয়াতে পুঁজিবাদী করপোরেশনগুলো বিনিয়োগ করেছে ২০ কোটি ডলার এবং লাভ তুলেছে ২৪০ কোটি ডলার। আফ্রিকা ও

ল্যাটিন আমেরিকায় এই বিনিয়োগ/মুনাফার হার হচ্ছে যথাক্রমে ২৭ কোটি/১০০ কোটি ডলার এবং ৮৮ কোটি/২৯০ কোটি ডলার। তৃতীয় আংকটাডের উদ্বোধন কালে চিলির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ ডঃ আলেন্দে বলেছিলেন, প্রতি এক ডলারের জন্য আমরা চার ডলার দিয়ে থাকি। কেননা তিনি খোদ মার্কিন সংস্থার হিসাব উদ্‌ধৃত করে দেখিয়েছেন ১৯৫০–'৬৭তে ল্যাটিন আমেরিকায় বিনিয়োজিত ৩৯০ কোটি ডলারের মুনাফা হিসেবে সে দিয়েছে ১৭৮০ কোটি ডলার।

তৃতীয় দুনিয়াকে প্রদত্ত ধনবাদী দেশের সাহায্য নিয়ে তাদের ঢাকঢোল পেটানোর অন্ত নেই। সাদামাটাভাবে সাহায্য কথাটির মানে নিঃস্বার্থভাবে কিছু দান করা। কিন্তু বাস্তবে এই সাহায্য যে কে কাকে করছে সেটাই বিবেচ্য।

প্রায় ১৫ বছর আগে শিল্পোন্নত দেশগুলো জাতিসংঘে শপথ নিয়েছিলো তাদের দরিদ্র ভাইদের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তারা স্ব স্ব মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্ততঃ ১ শতাংশ সাহায্য হিসেবে প্রদান করবে। তৃতীয় বিশ্ব আশা করেছিলো পাপ স্খালনের জন্য ন্যুনতম এই কাজটুকু তারা করবে। গত বছর জুলাই মাসে প্রতিশ্রুতি পালনের খতিয়ান নিয়ে দেখা গেছে তারা সাহায্য প্রদান করেছে জি, এন, পি'র মাত্র ০·৩৬ শতাংশ। সর্বোপরি তৃতীয় দুনিয়া লুঠের রাজা আমেরিকা দিয়েছে মাত্র ০·২৫ শতাংশ।

এবার এই ০·২৫ শতাংশের স্বরূপ বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯৭৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সমুদয় সাহায্যের ৩৬ শতাংশ হচ্ছে 'সরকারী সাহায্য', বাকী ৬৪ শতাংশ হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো প্রদত্ত উচ্চ হারে ঋণ অথবা ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ। হিসেবের সময় এগুলোকেও সাহায্য বলে চালানো হচ্ছে। তদুপরি ঐ ৩৬ শতাংশও কোন লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া দান নয়। যেমন ১৫ বছরে পরিশোধযোগ্য ৩ শতাংশ সুদের হারে প্রদত্ত ঋণের প্রকৃত সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৪৩ শতাংশ। এছাড়া রয়েছে ঋণের সঙ্গে জড়িত নানা শর্ত যেমন ঋণপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা কেবল দাতা দেশের

পণ্যই ক্রয় করা যাবে, গ্রহীতা দেশ বিদেশী শিল্পপুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। পুঁজিবাদী পণ্যের বাজার নিশ্চিত করার জন্যই তৃতীয় বিশ্বকে সাহায্য দেয়া হয়। ফলে একদিকে যেমন পণ্যবাজার নিশ্চিত হয় অপরদিকে তেমনি গ্রহীতা দেশকে ঋণজালে আবদ্ধ করে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করা যায়।

মার্কিন খাদ্য সাহায্য, যেটা অনেকেই দয়ার দান হিসেবে মাথা পেতে নিতে বাধ্য, ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। ক্রয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত, তলানীতে ঠেকে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় নিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার বহু ক্ষুৎপীড়িত দেশই নগদ মূল্যে খাদ্য ক্রয় করতে অক্ষম। অপরদিকে বিপুল উদ্বৃত্ত মার্কিন ফসলের নিশ্চিত বাজার চাই। তাই নানা সাহায্য কর্মসূচীর আওতার মধ্যে এনে উদ্বৃত্ত ফসল বাজারজাত করা হয়। 'ইউ এস নিউজ এ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট' পত্রিকা সম্প্রতি লিখেছে, সাহায্য কর্মসূচী-গুলোকে ধন্যবাদ তার ফলে মার্কিন কৃষককূল ১৯৬০ থেকে আজ অবধি ২৬০০ কোটি ডলারের খাদ্য রপ্তানী করতে সক্ষম হয়েছে।

খাদ্য কর্মসূচী রাজনীতির হাতিয়ারও বটে। সিনেটর ম্যাকগভার্ন, পুষ্টি সম্পর্কিত সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান, তাঁর রিপোর্টে অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজন বিচার করে উদ্বৃত খাদ্য বিতরণ করে না, বরং তা বিদেশ নীতির রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন চিলিতে আলেন্দে সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র চিলির জনগণকে প্রদত্ত খাদ্য সাহায্য বন্ধ করে দেয় এবং আলেন্দে সরকার উৎখাতের পর তা' পুনরায় চালু করে।

নয়া উপনিবেশিক শোষণের আরেক বড় হাতিয়ার হলো বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার গঠন কাঠামো বা built-in structure। এই ব্যবস্থার মোদ্দা কথা হলো কাঁচামালের প্রধান যোগানদার তৃতীয় বিশ্বের প্রাথমিক পণ্যের বাজার মূল্য অস্বাভাবিক রকম কম এবং শত মুদ্রাস্ফীতি বা চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও এর সামান্যই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে,

অপরদিকে শিল্পোন্নত ধনবাদী দেশ যখন এই কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্য আবার তৃতীয় বিশ্বে বিক্রয় করবে তখন তার দাম হবে আকাশচুম্বী এবং শনৈঃ শনৈঃ ঘটবে মূল্যবৃদ্ধি। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণের শরণ নিচ্ছি। ২·৬ বুশেল গম ক্রয় করতে শ্রীলংকাকে ১০ পাউণ্ড চা রপ্তানী করতে হয়, এটা ১৯৭০ সালের হিসাব। ১৯৭৪-এ দেখা গেলো ১০ পাউণ্ড চায়ের দামে সে পাচ্ছে ১·৭ বুশেল গম এবং ১৯৭৬-এর হিসেব মতো ২·৬ বুশেল গম ক্রয় করতে শ্রীলংকার প্রয়োজন পড়ছে ১৬·৫ পাউণ্ড চা রপ্তানীর।

২. রক্ত

A monster fearful and hideous, vast and eyeless.

Virgils Aenied.

ফেলিক্স গ্রীন তাঁর 'শত্রু' গ্রন্থে বেঁচে থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি কর্মপদ্ধতি অনুসরণের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এটা অতি-সরলীকরণ দোষে দুষ্ট তথাপি এই পদ্ধতি স্মরণ রাখলে সাম্রাজ্যবাদের কর্মধারা বোঝা সহজ হবে। তাঁর মতে এগুলো হচ্ছে (১) বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বকে পুঁজিবাদী রূপে বজায় রাখা (২) উদ্বৃত্ত পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগের পথ খোঁজা যার থেকে আসবে সর্বোচ্চ মুনাফা (৩) বিদেশে মার্কিন পণ্যের বাজার পাওয়া (৪) কাঁচা মালের উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (৫) বিশ্বব্যাপী নিরংকুশ সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

এই পাঁচটি সূত্রের প্রথমটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদের বহু কর্মকাণ্ডই এই লক্ষ্য থেকে পরিচালিত। তাই তৃতীয় দুনিয়ার কোন দেশ যখন পুঁজিবাদী কব্জা থেকে বেরিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তির পথে পা বাড়ায় তখন সাম্রাজ্যবাদ ক্ষিপ্ত আক্রমণে ঝাপিয়ে পড়ে। মানবাধিকার, ব্যক্তির অধিকার বা অলংঘনীয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব নিয়ে সোচ্চার রইলেও এমনি পরিস্থিতির মুখোমুখি সাম্রাজ্যবাদের সব মুখোশ খসে গিয়ে তার অতিকায়, চক্ষুহীন, ভয়ং-

কর রূপ বেরিয়ে পড়ে। এই দানব-মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ভিয়েতনামে। নদীর মালাপরা নিবিড় সবুজ দেশটিকে বোমায় বোমায় প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ। ভিয়েতনাম কোরিয়া বা ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদ সৈন্য পাঠিয়ে মুক্তি পথযাত্রা রোধ করতে চেয়েছিল। এমনি সরাসরি মঞ্চে অবতরন ছাড়াও আরো নানাভাবে সাম্রাজ্যবাদ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। গত জানুয়ারীর এক মেঘমুক্ত ঝলমলে দিনে আফ্রিকার বেনিনে আকাশ ফুঁড়ে নেমে এসেছিল ভাড়াটে হানাদার। ষোল বছর আগে অপর ভাড়াটে দঙ্গল এমনি বিমান-হামলা চালিয়েছিল কুবায়। সত্তরের শুরুতে পাতাল ফুঁড়ে উদয় হওয়ার মতো সাগর পথে আগত তস্করদল হামলা করেছিল গিনি। সকল ক্ষেত্রেই সতর্ক সরকার ও সজাগ জনগণের হাতে তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল আট-চল্লিশ ঘন্টার মধ্যে।

খোদ মার্কিন সেনা বা ভাড়াটে বাহিনী নয়, বশংবদ দেশীয় অনুচরেরাও নানা দেশে খাণ্ডবদাহন সৃষ্টি করেছে। মুক্তির আবেগে চঞ্চল, শৃঙ্খল মোচনের আন্দোলনে উত্তাল প্রতিটি দেশ মার্কিন আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। নিহতের মাথার খুলিতে রক্তপায়ী আদিম দানবের মতো চরম নৃশংস উপায়ে সাম্রাজ্যবাদ হত্যা করেছে জাতীয় মুক্তির বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল সি, আই, এ, প্রধান অ্যালেন ডালেস, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের অনুমোদনক্রমে। এবং লুমুম্বা গুমখুন হয়েছিলেন পুঁজিবাদের আফ্রিকান অনুচরদেরই হাতে। গিনি-বিসাউয়ের মুক্তি সংগ্রামের নেতা আমিলকার কাবরালকে খুন করেছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটে ক্রিমিন্যাল। মোজাম্বিক মুক্তি ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা নেতা এডুয়ার্ডো মণ্ডলেন পর্তুগীজ ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। ওয়াটারগেট-উত্তর মার্কিন সমাজে সরকারের অতীত কুকীর্তির যে কাহিনীসমূহ প্রকাশ পেয়েছে তার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে সি, আই, এ, তৎপরতার অকাট্য দলিল প্রমাণ। সি, আই, এ, সম্পর্কিত এই সব অভিযোগ

কোনো মার্কিনবিরোধী উত্থাপন করেন নি, এগুলো জানা গেছে মার্কিন সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। অধুনা উদঘাটিত দলিলে দেখা যায় মিসরের গামেল আবদুল নাসের, তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়ারেরে, গিনির আহমদ সেকুতুরে এবং কুবার ফিদেল ক্যাষ্ট্রোকে হত্যার জন্য বারংবার পরিকল্পনা এঁটেছিল সি, আই, এ,। ক্যাষ্ট্রো হত্যা ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে সিনেটের বিশেষ কমিটিকে সিনেটর স্ম্যাথার্স জানিয়েছেন, 'প্রেসিডেন্ট কেনেডি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাষ্ট্রোকে হত্যা করলে দক্ষিণ আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া কি হবে। ক্যাষ্ট্রো হত্যা নিয়ে আমরা আরো আলোচনা করলাম। আমার মনে আছে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিশ্চিত ছিলেন একাজ সমাধা করা হবে, এটা করা কোনো সমস্যাই না।" হোয়াইট হাউজে বসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অবলীলায় অপর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করার প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন এটা কোনো অলীক উপন্যাসের পাতা থেকে নয় বরং সিনেটের রিপোর্ট থেকেই উদ্‌ধৃত হলো।

হত্যার চরম পথ বেছে নেবার আগে সাম্রাজ্যবাদ নানামুখী তৎপরতায় স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট থাকে। তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র দেশে কোন সরকার যখনই প্রগতিমুখী পরিবর্তনে উদ্যোগী হন তখনই তাকে বহু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুষ্ঠুভাবে স্থিতিশীল পরিবেশে সরকার পরিচালনার কোনো অবকাশই সাম্রাজ্যবাদ রাখে না। অধুনা মার্কিন রাজনীতিবিদদের ব্যবহৃত ভাষায় এই জাতীয় কর্মতৎপরতাকে destabilisation বলা হয়ে থাকে। Destabilisation এর সার্থক উদাহরণ হচ্ছে চিলির আলেন্দে সরকার উৎখাত। ১৯৬৩ তেই প্রেসিডেন্ট কেনেডি সি, আই, একে নির্দেশ দিয়েছিলেন আলেন্দের ঐক্যজোট যেন ক্ষমতায় না আসে। অবশেষে কোনো উপায়েই যখন আলেন্দের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান ঠেকানো গেলো না তখন শুরু হলো অস্থিতিশীলকরণ প্রক্রিয়া। চিলিকে প্রতিশ্রুত ঋণ অস্বীকার করা হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে চিলির প্রধান পণ্য তামা বয়কট করা হলো, দেশের ভিতরে ভাড়াটে রাজনীতিবিদরা বাধিয়ে তুললো

নানা ঘোট, প্রচার মাধ্যমে চললো বল্গাহীন প্রচারণা, বিপুল অর্থব্যয়ে ট্রাকমালিকদের ধর্মঘটের আয়োজন করে অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলা হলো এবং সবশেষে সেনাবাহিনীর তাবেদার অংশ চরম আঘাত হানলো।

৩. বন্দীর মুক্তি

When all is said & done it is the so called little men, the bent backed, exploited, malnourished, blood-covered fighter for independence who decides. And he invariably decides for freedom.

Kwame Nkrumah

নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ, তা' সে যতই সূক্ষ্ম ও শক্ত হোক না কেন, পুঁজিবাদের পরাজয়কেই সূচিত করে। চিরায়ত উপনিবেশিক কায়দায় শোষণ চালাতে অক্ষম হয়েই পুঁজিবাদ পিছুহটা এই নতুন অবস্থান ও নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়কে উপনিবেশবাদের পতনের কাল হিসেবে চিহ্নিত করলে বলতে হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকারী প্রাক্তন উপনিবেশসমূহের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার সময়সীমা খুব বেশী নয়। কিন্তু ষাটের দশক থেকে অদ্যাবধি নব্যস্বাধীন দেশগুলোর ক্রিয়াকলাপ সাম্রাজ্যবাদের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত করে দিচ্ছে। কঠিন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তৃতীয় বিশ্ব তার মুক্তির পথ খুঁজে নিচ্ছে। এই পথ পুঁজিবাদ পরিহারের পথ, সমাজতন্ত্র অভিমুখী অধনবাদী বিকাশের পথ। এক ন্যায়সঙ্গত ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় দুনিয়ার লড়াইয়ের অটল সাথী হচ্ছে সমাজতন্ত্রী শিবির।

ষাট বছর আগে যে সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু আজ তা এক পরাক্রমী শক্তি। কিন্তু পুঁজিবাদের মতো ভিন্ন দেশ বা জনগণকে শোষণ করে সমাজতন্ত্রের সম্পদ গড়ে ওঠেনি। সমাজতন্ত্রের সম্পদ-স্ফীতি ঘটেছে

সমাজতন্ত্রী জনগণের মেহনতে। সোভিয়েতের অভ্যুদয় একদা যেমন উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপুল প্রেরণা নিয়ে হাজির হয়েছিল আজ তেমনি সমাজতন্ত্রী শিবিরের শক্তি তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে মদদ যোগাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তায় তৃতীয় দুনিয়ার দেশ যে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে আমাদের সমসাময়িককালে তার বলিষ্ঠ উদাহরণ মিলে ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্পুচিয়া এবং আফ্রিকায় এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও গিনি বিসাউতে।

অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনুন্নত জাতির লড়াই ক্রমশঃ তীব্রতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশসকল একত্রে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সচেষ্ট হচ্ছে। এর প্রমাণ মেলে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তে (১৯৭৪), ডাকারে কাঁচামাল সম্পর্কিত সম্মেলনে (১৯৭৫) নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আংকটাডে (১৯৭৭) ও সর্বোপরি তৈল রপ্তানীকারক দেশগুলোর সংস্থা ওপেকের ভূমিকায়। যত শক্তিধরই হোক না কেন সাম্রাজ্যবাদ আজ আর আগের মতো অনুন্নত বিশ্বের উপর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশের শর্তাদি চাপিয়ে দিতে পারে না। অধ্যাপক আর উলিয়ানোভস্কী এর চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন ঃ (১) ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুনিশ্চিত অবসান (২) সুগভীর সংকটে পতিত নয়া-উপনিবেশবাদ, যদিও সংকটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার উপায় সে এখনো খুঁজে চলছে (৩) আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে উন্নয়নশীল দেশের প্রভাব বৃদ্ধি (৪) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকৃত যোদ্ধাদের প্রতি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সতত সমর্থন।

তাই সময় হয়েছে নিকটে এবার। আজিকার ঐতিহাসিক কর্তব্য হচ্ছে অসম বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যবাদী 'সাহায্য'রূপী শৃংখলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়া-উপনিবেশিক ব্যবস্থা গুড়িয়ে দেয়া। নয়া-উপনিবেশবাদকে পরাজিত করা সম্ভব এবং পরাজিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে

একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহতকারী ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করতে হবে অপরদিকে তেমনি সতত সজাগ থাকতে হবে দেশের ভিতরে সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

錢

[illegible]